পুণ্য

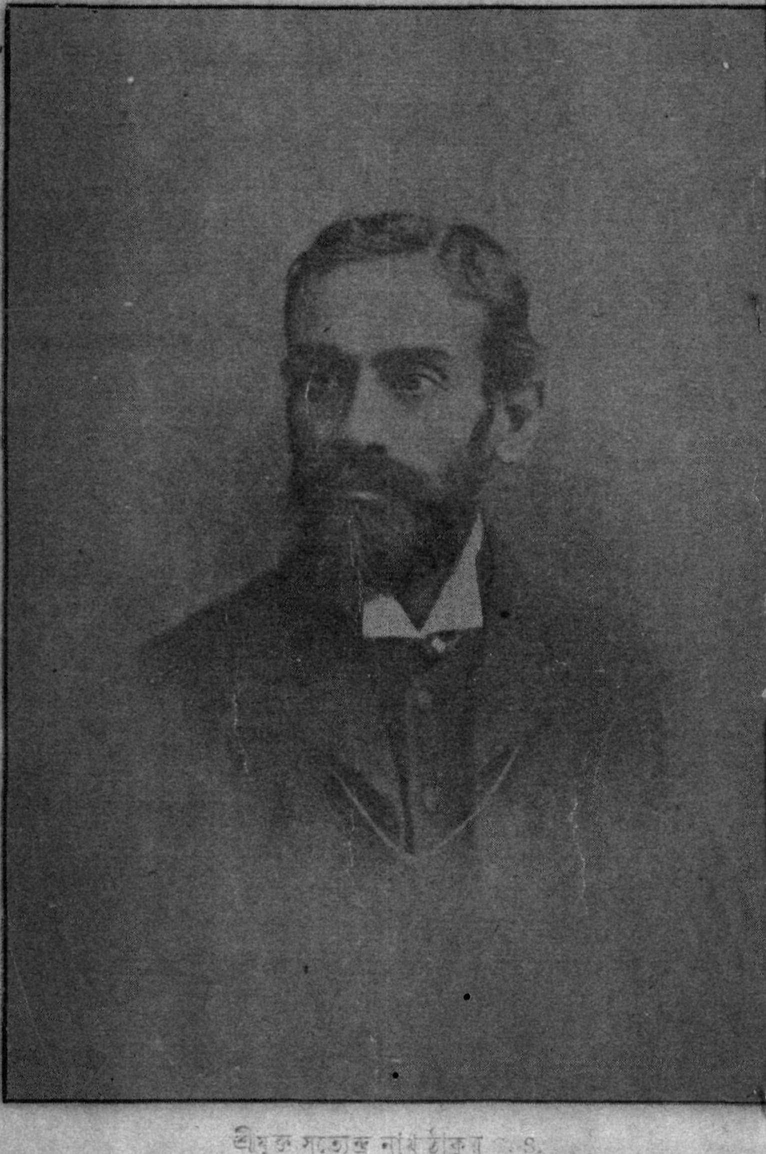
য় বর্ষ, "পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।" ২য় বর্ষ, ১৩০৬ শাল

ধর্ম্ম, সাহিত্য, পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, খাদ্যপাক, শিল্প, ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক চিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।



শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর I.C.S.

[illegible]

[illegible]

ও

পুণ্য।

পিতৃ তর্পণ।

অনন্ত আকাশ পানে চেয়ে দেখি যবে
বিশাল মূরতি তব মনে পড়ে তবে।
শুভক্ষণে সেই তুমি চির সুকরুণ
সুধীর নয়নে দিলে অমৃত যে ধন,
যে কথা শুনিয়া প্রাতে উদিল অরুণ,
সেই উপদেশ সদা জপিতেছে মন।
ব্যাধি মৃত্যু-সহচর দুর্নিবার ব্যাধ
লোলজিহ্বা অসময়ে পুরায়েছে সাধ,
জানে না কোথায় তুমি ;—তোমার হৃদয়
লোকপালদের মাঝে করে দিগ্বিজয়।
গেছ সেথা তুমি যেথা দেবতারা আছে,
সুগম্ভীর বসে আছ বাসবের কাছে ;
দেবলোকে করে তুলে লহ তুমি পিতা
তোমারে দিলাম আনি হৃদয়ের গীতা।

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

হিন্দুস্কুল অহিন্দু ভাবের উৎপত্তি স্থান।

গত বৎসর আমরা প্রাচীন ভারতের হিন্দুমহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার অবস্থা ও ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এইবারে নব্যভারতের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয় সাধ্যমত আলোচনা করিয়া দেখিব যে উভয়ের মধ্যে কোন্ কালের ব্যবস্থা আমাদের আদর্শস্থানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা নব্যভারতের সভ্যতার একটী অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে—ইহার প্রভাব কেহই সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রবন্ধে অনেক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে সাধারণত বর্ত্তমানে আমরা এই সম্বন্ধে বিপরীত মতবিশিষ্ট দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এক সম্প্রদায় দেশাচারের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতম বিরোধী। ইহাঁরা স্ত্রীলোকদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা করিয়া রাখিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার কথা উল্লেখ করিলেই দেশাচার ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সকলকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা নিজে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহাদের সে অবকাশ, ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই বলিয়া বোধ হয়। সকল দেশেরই অবনতির সময় যেরূপ ঘটে, ভারতেরও এই অবনতির কালে সেইরূপ মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রকৃত সত্য-শিক্ষাদান বিষয়ে নানা ঘটনাসূত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে ভারতের অন্যান্য ধনীমানী ব্যক্তিরাও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা না দিলেই উপযুক্ত সম্মান রক্ষিত হয় এইরূপ মিথ্যা সম্মান জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইলেন এবং এই ভাব ক্রমে নামিতে নামিতে ভারতের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল।

যে সম্প্রদায় দেশাচারকে এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই ইত্যাদি নানা উপায়ে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়েন, সাধারণত সেই সম্প্রদায়ের অপর নাম রক্ষণশীল সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজের ধনী মানী প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয়

অধিকাংশ ব্যক্তিই বরাবর ছিলেন এবং এখনও আছেন। অথবা ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম যে সমাজের অধিকাংশ অগ্রগণ্য ব্যক্তিই রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। সামাজিক কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলেই প্রথমে তাঁহাদেরই স্বার্থ-নাশের ও প্রতিষ্ঠাহানির ভয় উপস্থিত হয়। যাহাহউক্, প্রধান প্রধান ব্যক্তি-দিগের দৃষ্টান্তে এবং মুসলমান নবাবদিগের প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধীভাব এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে ভদ্র পরিবারের কোন স্ত্রীলোক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভদ্রবেশে সজ্জিত হইয়াও অন্তঃপুরের বাহিরে পদার্পণ করিলেই তাহা অভদ্রোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়; বিশেষ কার্য্যোপলক্ষেও কোন মহিলা আত্মীয়স্বজনের অতিরিক্ত অপর ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথন করিলেই তাঁহার অপবাদ রটিতে তিলমাত্র বিলম্ব ঘটে না। এই সেদিন ভূমিকম্পের সময় দেখিয়াছি যে পুরমহিলারা প্রাণের ভয়ে ভীত হইলেও অন্তঃপুরের একপদও বাহিরে আসিতে সম্মত ছিলেন না। আর আমাদেরও এমনি অভ্যাস ও শিক্ষা যে কোন ইংরাজ রমণী কার্য্যোপ-লক্ষে বাহিরে আসিলে আমরা দূর হইতে সম্মানের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি ও ব্যবহার করি; কিন্তু কোন হিন্দুমহিলা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিলেই, আমরা অবস্থা ও কারণনির্ব্বিশেষে তাঁহার দিকে হৃদণ্ড বিস্তৃতনেত্রে অভদ্রোচিতভাবে অবলোকন না করিয়া পরিতৃপ্ত হই না। কেবল তাহাই নহে, এদেশে স্ত্রীলোকে দেশাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় আচার অনুসরণ করিলেও তাঁহার অপবাদ রটিতে বিলম্ব হয় না। প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নেতা * তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যথার্থ লজ্জানিবারক পরিচ্ছদ এবং "সোপানৎকঃ সদাব্রজেৎ" এই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উপানহের ব্যবহার প্রচলিত করাতে স্বদেশে তাঁহাকে লোকে পরোক্ষে খৃষ্টান বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দুর্ব্বল বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা স্ব-ইচ্ছাতেও যদি কখনও বিদ্যাশিক্ষা করে এবং কুচক্রী আত্মীয়স্বজনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার যদি কোন সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তাহারই পক্ষে যেন কণ্টক অর্পণ করিবার জন্যই প্রবাদ উঠিল যে স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়। এইরূপঃ নানা প্রকার অসঙ্গত ভাব ক্রমশ সমাজের সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করাতে ফল

* ইহাঁর নাম বিশেষ কারণে অপ্রকাশিত রহিল।

এই দাঁড়াইয়াছে যে হিন্দুরমণী বর্ত্তমানে পুরুষদিগের—স্ত্রী স্বামীর, ভগ্নী ভ্রাতার, কন্যা পিতার বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ ভাব থাকাতেই "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" প্রভৃতি প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে বোধ হয়। এই সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাব পোষণ করাতে আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়পক্ষেরই অমঙ্গল রাশি সঞ্চিত হইতেছে; আশঙ্কা হয় কোন্ দিন অজ্ঞাতসারে আমরা ঘোর অমঙ্গলসাগরে নিমজ্জিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইব। এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় ভ্রমে পড়িয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের সমর্থন করিয়া দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করেন। এই সম্প্রদায়কে আমরা অজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

দ্বিতীয় সম্প্রদায় উপরোক্ত সম্প্রদায়ের ঠিক বিপরীত দিকে স্বীয় গন্তব্য পথ স্থির করিয়াছেন। প্রথম সম্প্রদায় যেরূপ দেশাচার অনুসরণ করিয়া চলেন, এই সম্প্রদায় তেমনি দেশাচার শাস্ত্রমর্য্যাদা প্রভৃতি সকলই উড়াইয়া দিয়া নিজের বুদ্ধির উপর বড়ই বেশী নির্ভর করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহা-দিগকে আমরা বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিব। প্রথমোক্ত অজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের অজ্ঞান দূর করা বড় বেশী কঠিন কার্য্য নহে, কারণ তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রানুসারেই চলিতেছেন মনে করিয়া কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রার্থের অনবগতি বশতই বিপথে চলেন; তাঁহাদের অনেকেই যুক্তি বিচারে প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারিলে নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। কিন্তু বিজ্ঞানান্ধ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অজ্ঞান দূর করা বড়ই দুঃসাধ্য। তাঁহাদের অন্তরে অজ্ঞানের উপর বিজ্ঞানের এমন এক ঘোর অহমিকার আবরণ পড়িয়া থাকে যে তাহা অপসৃত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইয়া দেওয়া অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁহারা যত অধিক ইউরোপীয় সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহারাই বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের তত অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই সংস্পর্শ পাশ্চাত্য পুস্তক পাঠেও লাভ করা যায়, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণেও এইরূপ ফল পাওয়া যায়। যে সকল স্বদেশীয় হিন্দু সন্তান সহসা সামাজিক দেশা-চারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ ঘুরিয়া আইসেন,

তাঁহারাই সচরাচর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বিজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কাছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রত্যেক কথা, তাহা সিদ্ধান্ত হউক বা না হউক বেদবৎ মান্য; কিন্তু স্বদেশীয় শাস্ত্রের সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার যোগ্য। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অমুক দেশাচার শাস্ত্রমূলক শুনিলে, শাস্ত্রের নামেই মুগ্ধ হইয়া যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও অন্তত কথায় তাহা যেরূপ স্বীকার করিয়া লয়েন, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সেইরূপ শাস্ত্রনাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন।

হিন্দুস্কুলের স্থাপনাই এইরূপ অশ্রদ্ধের ভাবের প্রধান উৎপত্তি-হেতু; বিশেষত ডিরোজিওর ন্যায় তদানীন্তন শিক্ষকদিগের কৃপায় ছাত্রদিগের হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল হইবার পক্ষে অনেক সহায় জুটিয়াছিল। পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষ কোম্পানির অধীনে ছিল, তখন অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দেশীয়দিগের শিক্ষাবিষয়েও গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগ ছিল। কেবল তাহাই নহে, দেশীয়দিগের যাহাতে নৈতিক উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েও গবর্ণমেন্টের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দ্বিতীয়বার যে কবালা প্রদত্ত হয়, তাহাতে "সাহিত্য চর্চ্চার পুনরুদ্দীপনা ও উন্নতিসাধন, ভারতের বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের উৎসাহদান এবং ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে বিজ্ঞানের বিস্তার" এই কয়েকটী বিষয়ের জন্য প্রত্যেক বৎসর লক্ষ টাকা পৃথক্ গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা হয়। স্বদেশীয়দিগের নিকটে এই বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে দশ বৎসর কাল এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধন বিষয়ে রীতিমত কোনই উপায় অবলম্বিত হয় নাই। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল তাঁহার সভার এক অধিবেশনে দেশীয় "সর্ব্বসাধারণের নীতি ও চরিত্রের উন্নতি সাধন, জনসাধারণের মধ্যে সংসারের হিতসাধক জ্ঞানের প্রবর্ত্তনা, তাহাদের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার উন্নতির বিষয়ে গবর্ণমেন্টে প্রস্তাব প্রেরণ" এই সকল বিষয়ের জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যুবকদিগকে ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য কেবল মাত্র দেশীয়দিগেরই বদান্যতায় হিন্দুবিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপিত হয়। এই হিন্দুকলেজকে আপনাদিগের অধীনে আনিয়া

উন্নতি সাধন করা উক্ত কমিটির অন্যতর প্রস্তাব হইল। এদিকে ন্যূনাধিক ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম এখানে মাত্র সংস্কৃতশিক্ষা হইলেও ক্রমশ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তখন দেশীয়দিগের হৃদয়ে আঘাত না দিয়া শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইত এবং করাও হইত। হিন্দুকলেজেরও উৎসাহপ্রদান কমিটির মনোযোগের একটী প্রধান বিষয় ছিল এবং তাঁহারা তাহা হইতে আশাতীত ফলও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দৃষ্টান্তে চতুর্দ্দিকে ইংরাজী শিখিবার একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুকলেজে তদানীন্তন শিক্ষার নৈতিক ফলে কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করিলেও আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ আমাদিগের গার্হস্থ্য জীবনে প্রতি পদক্ষেপে সুফলের সহিত তাহার কুফলও ভোগ করিতে হইতেছে। কমিটির রিপোর্ট হইতেই আমরা নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম,—"The moral effect has been equally remarkable, and an impatience of the restrictions of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly avowed by many young men of respectable birth and talents, and entertained by many more who outwardly conform to the practices of their countrymen."

ইংরাজদিগের নূতন আমলে ইংরাজী শিখিবার ধুয়া উঠা কিছু অস্বাভাবিক নহে। এই ধুয়ার পরিমাণ খৃষ্টাব্দ ১৮৩৪ ও ১৮৩৫, এই দুই বৎসরের বিক্রীত পুস্তক হইতে সুন্দর উপলব্ধ হইবে। এই দুই বৎসরে খাঁটী ইংরাজী পুস্তক ৩১৬৪৯ খানি বিক্রয় হইয়াছিল; আংশিক ইংরাজী পুস্তক (আংশিক অন্যভাষায় লিখিত) ৪৫২৫; বাঙ্গালা পুস্তক ৫৭৫৪; হিন্দী ৪১৭১; হিন্দুস্থানী ৩৩৮৪; পারসী ১৪৫৪; উড়িয়া ৮৩৪; আরবী ৩৬ এবং সংস্কৃত ১৬ খানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছিল। আর, ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতিসাধনে গবর্ণমেণ্টের এবং উপরোক্ত কমিটির যে চেষ্টা ও ইচ্ছা ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র উপস্থিত হইতে পারে না—উক্ত কমিটির রিপোর্ট এবং গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন আদেশে এই ভাব সুব্যক্তই রহিয়াছে। আজকাল তো বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় সমস্ত শিক্ষা ও

পরীক্ষা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এখন তাঁহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সহজে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সেই আদিকালে গবর্ণমেণ্ট এবং সর্ব্বসাধারণে ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। * তখন শিক্ষকের অভাবে, পুস্তকের অভাবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত করা যায় নাই। আজকালকার দিনে এই আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। যাই হউক্, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি সাধনার্থই ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের বিশেষভাবে উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পূর্ব্বোদ্ধৃত রিপোর্টের অংশ হইতে বুঝিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট নৈতিক উন্নতির অর্থে ভুল বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে স্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগেরই অপর নাম উন্নতি। তখনকার শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই উন্নতির এই প্রকার ভ্রান্ত অর্থ বুঝিয়া ছাত্রদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। এইরূপে হিন্দুস্কুলেরই স্থাপনা বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধেয় ভাবের উৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়াছিল।

এই অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তার বিষয়ে হিন্দুস্কুলের অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষাদানই সর্ব্বাপেক্ষা সহায় হইয়াছিল। তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকে শাস্ত্রের কথা দূরে থাক্, ঈশ্বর প্রভৃতিকে ছাড়িয়া ধার্ম্মিক (?) হইবার উপদেশ দিয়া কতকগুলি অহংবৃদ্ধ অধার্ম্মিক ছাত্রের জন্মদান করিবার সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ৺কিশোরী চাঁদ মিত্র "হিন্দুস্কুলের ইতিবৃত্ত" পুস্তিকায় তদানীন্তন কোন সংবাদপত্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন —"Cutting their way through ham and beef and wading to

---

* It was admitted on all sides that * * the instruction of the mass of the people through the medium of their own language was the ultimate object to be kept in view. "On the Education of the people of India" by C. Treveleyan C. S.

liberalism through tumblers of beer." ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ও তাঁহার "সেকাল আর একাল" পুস্তকে নব্যযুগের আদি শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। "তথনকার সময় গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্য-দিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধতবেশে দোকান-দারদের নিকটে গিয়া বলিতেন "গোরু খেতে পারিস ? গোরুখেতে পারিস ?" এইরূপে প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা আস্ফা-লন করিয়া বেড়াইতেন। একবার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েক দিন মন্ত্রণা হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয় না। শেষে একজন অপেক্ষাকৃত সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতর গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গীগণ তিনবার গগনভেদী স্বরে 'Hip! Hip! Hurrah'! বলিয়া উঠিলেন।" *

ডিরোজিও প্রভৃতির উপদিষ্ট নাস্তিকতা এবং ভ্রান্ত উন্নতির পথ হইতে প্রধানত ব্রাহ্মসমাজ এবং মাত্র নাস্তিকতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক ডফ সাহেব তদানীন্তন যুবক বৃন্দকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ডফ সাহেব একমাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মকেই তাঁহাদের উদ্ধা-রের প্রকৃত উপায় ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রের ভূরি ভূরি দোষ (সকল গুলি দোষের বিষয় না হইলেও তিনি যে গুলি দোষ বলিয়া মনে করিতেন তাহাই) প্রদর্শন পূর্ব্বক হিন্দু যুবকদিগকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বীতরাগ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ

* সেকাল আর একাল।

করিতে পারেন নাই। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজেও এমন এক সময় আসিয়াছিল, যে সময়ে তাহার প্রচারকগণ নিতান্ত শৈশবের ন্যায় আচরণ করিয়া খৃষ্টানদিগের ন্যায় স্বায় জাতায় শাস্ত্রের প্রতি হিন্দু সমাজের অনুরাগ হ্রাস করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমাদের অদৃষ্টে যে কুফল ফলিবার ছিল তাহা ফলিয়াছে এবং আজও ফলিতেছে। বর্ত্তমানে দুঃখের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইয়া একটু পশ্চাদগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের উক্ত অশ্রদ্ধেয় ভাবের যে পরিপুষ্টি হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের অবির্ভাবকালে ইহার ন্যায় সদ্বিষয়ে উদ্যমশীল একটী সমাজের বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছিল। তখন একদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের আগাছাগুলির অসারতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মেরই অসারতা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া তদানীন্তন হিন্দু যুবকদিগের মতিগতি আকর্ষণ করিতেছিলেন; অপর দিকে প্রাচীন ও রোগজীর্ণ হিন্দুসমাজের প্রাচীন নেতাগণ ইহাতে ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সারহিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে সমাজবন্ধন কঠিনতর করিয়া সমাজরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, প্রাচীন নেতাগণ কিছুতেই হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। ইত্যবসরে অতি সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শুভ আবির্ভাব হইল। তিনি একদিকে হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল প্রচলিত ধর্ম্মেরই আগাছাগুলির অসারতাপ্রতিপন্ন করিলেন; অপরদিকে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যভাবের দ্বন্দ্ব বিদূরিত করিয়া হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং তাহারই সাক্ষ্যস্বরূপে এক ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ ও শ্রদ্ধান্বিতচিত্ত কয়েকটী মহাত্মা ইহার সহকারী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ভারগ্রহণ করিলে ঘটনাচক্রে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কয়েক ব্যক্তি ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রধান কর্ম্মকারক হইয়াছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের উপদেশে লালিত পালিত হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান একেবারেই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং সেই কারণে শাস্ত্র ও ঋষিমুনিদিগের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও খুব কমই ছিল; তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকেই তাঁহারা হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় বক্তৃতাদির দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই তাঁহাদের প্রচারের মূল মন্ত্র ছিল। ফরাসিবিপ্লবে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারিতার উৎপাদক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে এমন কয়েকটী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব বলিদান করিতে বাস্তবিকই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এমনও অনেক সভ্য হইলেন, যাঁহারা হিন্দুসমাজের বন্ধন যে কোন উপায়ে ছিন্ন করিয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে অভিলাষী ছিলেন। ইহাঁদের সকলেরই মূল মন্ত্র একই ছিল—সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। এই সকল সভ্যদিগের অধিকাংশই নেতাদিগের দৃষ্টান্তে ক্রমে পাশ্চাত্যভাবে সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদিগের মধ্যে যে প্রাচ্যশিক্ষিত সাধুপুরুষ ছিলেন না তাহা নহে, তবে পাশ্চাত্যশিক্ষিত নেতাদিগেরই বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষালব্ধ নেতাগণ প্রথমত পাশ্চাত্য যুক্তিতর্কের অস্ত্র লইয়া পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের এবং দেশের কল্যাণসাধন করিলেন; কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই প্রাচ্যশিক্ষিত ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতাগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথম সম্প্রদায় সামাজিক পরাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে অগ্রসর; দ্বিতীয় সম্প্রদায় সামাজিক পরাধীনতার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্রাহ্মগণ পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু বেশী রকম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন না যে সমাজে অবস্থান করিতে গেলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটী সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে

হইবে। তাঁহারা এই সহজ কথা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকার সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজীভাবায় চারিদিকে ইহার মন্ত্রবীজ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিলাতপ্রত্যাগত প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্পর্শপ্রাপ্ত এবং স্বাধীনতার নামমোহে বিমূঢ় ও তরলরুবির অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র কণ্ঠভূষণ করিয়া লইলেন। একবার যখন এই বিষবীজ রোপিত হইল, তখন এই সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে যে তাহার বিষময় ফলভোগ এবং তজ্জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত পৃথক সমাজের তদানীন্তন নেতাগণ অন্যান্য সভ্যদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া যখন সীমা নির্দিষ্ট করিতে গেলেন, তখন সেই সভ্যদিগের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতাস্বরূপে উত্থিত হইয়া পূর্ব্ব নেতাদিগের উপর যথেচ্ছাচারিতার দোষারোপ পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া অপর একটী পৃথক্ সমাজ স্থাপন করিলেন। বর্ত্তমানে অত্যধিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয় অধিকাংশ ব্যক্তিই এই সর্ব্বশেষোক্ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে অতিমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষবীজ যথেচ্ছাচারিতা বৃক্ষের উৎপাদক হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হইতে সুফল প্রসব-সম্ভাবনার পথে অত্যধিক ও অতি গুরুতর অন্তরায় সমূহ উপস্থিত করিয়াছে ও করিতেছে।

রসায়ন বিজ্ঞানের উপকারিতা।

আজি আমাদের বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম দিন, এই জন্য সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে প্রণাম করিয়া শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। যদি ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কোন বস্তু থাকে, যাহাতে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ হয়, তাহা কেবল একমাত্র জ্ঞান। জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের-সত্য সকল অবগত হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করি। সেই ঈশ্বরকে বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য এবং তাঁহার প্রতি স্বচ্ছ প্রেম প্রবাহিত করিবার জন্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। যাহা দ্বারা পদার্থের গঠনতত্ত্ব, কার্য্যতত্ত্ব, কার্য্যনিয়মতত্ত্ব, পারস্পরিক সম্বন্ধতত্ত্ব এবং কারণ অবগত

হওয়া যায়, তাহার নাম বিজ্ঞানশাস্ত্র। প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র এই জগৎ; তাহার অধ্যাপক ঈশ্বর; দেবমনুষ্য অধ্যেতা; সজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ অধ্যয়ন। বিশ্ববিজ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—জড় অথবা ভৌতিকতত্ত্ববিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান। মৃত্তিকা, জল, বায়ু, তাড়িত, তাপ, আলোক পশুউদ্ভিজ্জ প্রভৃতি মনুষ্যের শরীর পর্য্যন্ত, যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, সে সকল ভৌতিকতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; আত্মা প্রভৃতি যে সকল বিষয় অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহা আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। আবার এই দুই বিজ্ঞানের বিশেষ কোন ভাগ আলোচনা করিবার নিমিত্ত ইহাদের উপবিভাগ করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিজ্ঞানের এক একটী তত্ত্ব এত অসীম ও দুরবগাহ যে কেহই তাহার তলস্পর্শ করিতে পারে নাই এবং পারিবে যে, তাহার আশা করা যায় না। যাহার মন বিক্ষেপশূন্য হয়, এবং যিনি মনকে বশীভূত করিয়া এক বিষয়ে বিনিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারেন ও বৃত্তিসকল সংযত করিতে পারেন, তিনিই স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা দ্বারা তত্ত্বলাভ করিতে পারেন; ইহাতে কঠোরতা চাই। এই কঠোরতার লাঘবার্থে সাধারণে পররচিত গ্রন্থপাঠ দ্বারাই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে ভালবাসেন কিন্তু তাহা বিজ্ঞানের প্রতিবিম্বমাত্র; আর ইহাতে আপনার পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে মনুষ্যরচিত গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদ দোষেরও নিরাকরণ হয় না—একই ভুল বরাবর চলিয়া আসিয়া সকলকে ভ্রান্ত করিয়া তুলে।

মনুষ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া ভ্রমপ্রমাদদোষে দূষিত হয় বলিয়া বিশ্ববিজ্ঞান যে ভ্রান্ত, তাহা নহে। বিশ্ববিজ্ঞানের প্রতিবিম্বমাত্র যে মনুষ্যরচিত বিজ্ঞান, তাহাতে সত্যও থাকিতে পারে মিথ্যাও থাকিতে পারে; এই জন্য বিজ্ঞান-প্রতিবিম্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ক্ষোভ নিবারণ হয় না, এই জন্যই বিজ্ঞান-প্রতিবিম্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজের নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে পরমেশ্বরের রচিত বিশ্বপুস্তকে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই; যাহা কিছু ভ্রান্তি, তাহা আমাদের পড়িবার ও বুঝিবার ভ্রান্তি।

পূর্ব্বে যে দুইটী বিজ্ঞানের কথা বলা হইল তন্মধ্যে রসায়নশাস্ত্র জড়তত্ত্ব-

বিজ্ঞানের একটী উপশাখা মাত্র। প্রাকৃতিক জগতে যে সকল সংযোগ বিয়োগ হয়, তত্তাবতের নিগূঢ় তথ্যানুসন্ধান করা রসায়ন শাস্ত্রের বিষয়; যে সকল ভৌতিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকলের মূলান্বেষণ করাই এই বিদ্যার বিষয়। সংযোগবিয়োগ হইয়া যে সকল ভূত উৎপন্ন হইল তাহাদের ও তাহাদের উপাদান সকলের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করাও রসায়নের প্রধান কার্য্য। রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী সেই সকল শাস্ত্র, যে সকল শাস্ত্রে তাপ, তাড়িত, আলোক, সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণ, জল, বায়ু প্রভৃতির তত্ত্ব সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই সকল শাস্ত্র জানা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রকৃত বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞানের পুস্তক বিজ্ঞান নহে। পরমেশ্বর জগতে যে সকল ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে যাহা বুঝিতে পারিয়াছে, সে তাহাই লিখিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস না করিয়া পর্য্যবেক্ষণ-পরায়ণ হইয়া সেই সকল দেখিতে হইবে, তবে তাহা ঠিক জানা হইবে; অন্যের কথা শুনিয়া জানিলেও তেমন আনন্দ হয় না। যেমন, যে লবণ আমরা আহার করি, তাহা যেন দেখিতে এক পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহা দুই পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হয়—এক, ক্লোরীন্ (হরিতন) নামক উগ্রগন্ধযুক্ত বায়বীয় পদার্থ, আর সোডিয়ম (সর্জ্জ) নামক ধাতবীয় কঠিন পদার্থ, এই উভয়ের সংযোগে উপাদেয় সামগ্রী লবণ প্রস্তুত হয়। যে আপন স্বাধীন চেষ্টায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা জানিতে পারে, তাহার যেমন আনন্দ হয়, অন্যের চর্চ্চিত বিষয় পড়িয়া আমাদের তেমন আনন্দ হয় না। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই দ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইবে; আবার অন্য বস্তুর সংযোগে ঐ বস্তুর কিরূপ সংযোগ বিয়োগ ও কিরূপ গুণ হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

পরীক্ষার যত উপায় আছে, তদ্দ্বারা পরীক্ষা করিলে তবে তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং তাহা আপনার বলিয়া বোধ হয়। নিজে যে সবই করিতে পারি তাহা নহে, তবে মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়া যতদূর সাধ্য তাহা করা উচিত; এবং সেই আপনার কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য, নিজের সহায়তার জন্য, অমুক অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি অমুক অমুক বিষয়ে কি কি লিখিয়াছেন তাহা জানিলে আপনার কার্য্যের

অনেক সহায়তা হয়। নিজের কার্য্য করিবই ; তাহার জন্য অন্যান্য জ্ঞানী-দের নিকট সহায়তা লইব—ইহাতে অন্যের ভ্রম দেখিয়াও আপনার কার্য্যের সুবিধা হয়। আমরা অন্যের নিকট হইতে দুই রকমে উপদেশ লইতে পারি—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আর অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে ; এক, অন্যের সত্য সংস্করণ দেখিয়া শিক্ষা করা যায় ; আর অন্যের ভুল দেখিয়া জ্ঞানলাভ করা যায়—ঐ ব্যক্তির এই কার্য্যে এই ভুল হইয়াছে, অতএব আমি ঐ পথে গিয়া ঐ ভুল করিব না।

এই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। বিজ্ঞানতত্ত্ব জানিবার লক্ষ্য, এই সকল তত্ত্বপরম্পরা দ্বারা মূলতত্ত্ব ঈশ্বরকে জানা। যে ঈশ্বরকে জানে, এই সকল তত্ত্ব তাহার পক্ষে নিম্নতলে পড়িয়া গেল—বিজ্ঞানতত্ত্ব মূলতত্ত্বের সোপান। যেমন—এই কাগজ রহিয়াছে, ইহাকে ছিঁড়িয়া দশখণ্ড করিলাম, তাহার একটীকে আবার বিশখণ্ড করিলাম, তাহার একটীকে আবার চল্লিশ খণ্ড করিলাম ; এইরূপে এত সূক্ষ্ম ভাগ করিলাম যে চক্ষে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার উপর কি ভাগ হইবে না ?—বরাবর ভাগ হইবে ; অনন্ত কাল ভাগের দিকে চলিল। দেখ, একখণ্ড কাগজ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মন অনন্তের দিকে ধাবিত হইল। ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছা হইতে কাগজের উপকরণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া একখণ্ড কাগজও অনন্তের চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। আমরা অনন্ত ঈশ্বরকে কাগজের কণার মধ্যে যেমন দেখিতে পাইতেছি, অনেক বিদ্বান্ লোকেরা মহান্ সূর্য্য চন্দ্রের মধ্যেও হয়তো ঈশ্বরকে তেমন দেখিতে পান না।

যেমন এই বড় বাড়ী আছে, এই বাড়ীকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইলে ইহার প্রতি গৃহকে আগে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়, তেমনি বিশ্ব-বিজ্ঞানকে বিভক্ত না করিলে সম্যক্ জানা যায় না ; একবারেই সমস্ত ধারণ করিব কি প্রকারে—চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে, মন অবসন্ন হইয়া পড়িবে। এক একটী বিষয় এক এক সময়ে লইয়া আলোচনা করা উচিত। আমরা এখন লইলাম কি—পৃথিবীর ভিতরে যে সকল সংযোগ বিয়োগ হইতেছে তাহাই লইলাম। এই দেওয়াল রহিয়াছে, ইহাকে যদি বিয়োগ করা যায়—রাসায়নিক বিয়োগ নহে—যদি ইহাকে ভগ্ন করা যায়, চুন, সুরকী, ইট, বালি, এই সকল উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু চুনকে যদি রাসায়নিক বিয়োগ কর, তাহা হইতে

দুইটী জিনিস বাহির হইবে—অক্সিজেন (অম্লজান) বায়ু ও ধাতবীয় ক্যালসিয়ম (চূর্ণসার); বালিতে অ-ধাতবীয় সিলিকন (শিলিক) পদার্থ ও অম্লজান বায়ু পাওয়া যাইবে; তেমনি ইটে ও সুরকীতে অম্লজান বায়ু ও লৌহ প্রভৃতি কতকগুলি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যাইবে; তাই বলিয়া ক্রমশই যে ঐ সকল দ্রব্য অধিক পাইতে থাকিব তাহা নহে। তিন চার পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ঐ সকল প্রস্তুত হইয়াছে; যেমন সপ্তাশ্ব সূর্য্যের সাত প্রকার রশ্মি, যাহা সূর্য্যের আগে আগে দৌড়ায়, সেই সাত বর্ণের বিভিন্ন মিশ্রণে এত প্রকার বর্ণ আমরা দেখিতে পাই—কখন গোলাপ ফুলের বর্ণ হইতেছে, কখন চাঁপাফুলের বর্ণ হইতেছে। কিন্তু সাতটা রঙের বেশী কোন কিছুতেই নাই। ঐ সাত বর্ণের মধ্যে কতকগুলি বর্ণ একভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একপ্রকার বর্ণ হইল; আর এক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আর এক প্রকার বর্ণ হইল; ইহাতেও সাতটা রঙের অতিরিক্ত কিছুই নাই, উহাতেও সেই সাতটা রঙের অতিরিক্ত কিছুই নাই, সেইরূপ কতকগুলি পদার্থের বিভিন্ন সংযোগে ইট, সুরকী, চুন, প্রভৃতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে বিয়োগ করিলে গোটাকয়েক মাত্র বস্তু পাওয়া যায়, যাহাদিগকে আর ভাগ করিতে পারি না, তাহাদিগের নাম মৌলিক পদার্থ বা রূঢ়িক পদার্থ। আবার ঐ বিয়োজিত বস্তু সকলকে সংযোগ করিয়া ইট প্রভৃতি যদি প্রস্তুত করিতে পারি, তবেই পরীক্ষা একবারে সম্পূর্ণ হইল—বিয়োগের বেলায় যে প্রকার হইল, সংযোগের বেলায়ও ঠিক তাহাই হইল; যেমন দশকে বিভক্ত করিলে দশটা এক হইয়া গেল, আবার ঐ দশটা এককে যোগ করিলে দশ হইল, তবেই আর তাহাতে ভুল রহিল না। এইরূপে একবার বিয়োগ করিতে করিতে যাইতে হয়, একবার যোগ করিতে করিতে যাইতে হয়—উল্টাপাল্টা করিয়া দেখিতে হয়।

এইরূপে মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে চৌষট্টি বস্তু পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের মধ্যে নানা প্রকার সংযোগে পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু হইয়াছে এবং যত কিছু কার্য্য চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল চৌষট্টি অক্ষরে!—যেমন, একটা পুস্তকে কতকগুলি লাইন থাকে, প্রতি লাইনে কতকগুলি কথা থাকে, সেই সব কথাতে কতকগুলি অক্ষর থাকে;—মনে কর, একটা বইয়েতে দশলক্ষ অক্ষর আছে, যদি তাহা ইংরাজী পুস্তক হয়, সেই

অক্ষর সকল আসিয়া মিলিবে ছাব্বিশ অক্ষরে ; যদি তাহা বাঙ্গালা অক্ষরে পুস্তক হয়, অক্ষর সকল আসিয়া মিলিবে পঞ্চাশে। যেমন এই কয়টী অক্ষরের মধ্যে বিভিন্নরূপ সংযোগ দ্বারা সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তেমনি সমস্ত পৃথিবীকে বিশ্লেষিত করিলে তড়িৎ, তাপ আলোক আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি এবং চৌষট্টি ভৌতিক প্রদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে এইরূপে আপনার অঙ্গুলির গণনার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে আনিয়া ফেলিল, সে মুঠার ভিতরে জগতকে আনিল এবং তাহার মধ্যে বিচিত্রশক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। পরমাণুর মধ্যে, ঈশ্বরের সত্তা ও সহায়তা ভিন্ন সংযোগ বিয়োগ সাধিতে হইতে পারে না। ঘড়ির কলে দম দিলে দম দিবার সময় যত পরিমাণ শক্তি তাহাতে গচ্ছিত করা হইয়াছিল যতক্ষণ সেই শক্তি থাকিল ততক্ষণ ঘড়ি বেশ চলিতে লাগিল, যেই তাহা ফুরাইয়া গেল অমনি তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। ফলতঃ ঘড়ির আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা নহি ; পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর গুণাগুণ অবগত হইয়া এরূপে তাহাদিগকে রচনা করিলাম যে তাহারা কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিতে লাগিল, কিন্তু পরমেশ্বর স্রষ্টা, সুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠানেই প্রতি পরমাণু কার্য্যতৎপর রহিয়াছে। একটা কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম ; তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেই কাগজ পচিয়া অণুতে বিভক্ত হইয়া গেল ; হয়তো তাহার পরে সারমাটির সঙ্গে গিয়া তাহা কোন গাছের শাখায় বা ফলে প্রবেশ করিল ; তাহাকে আবার জন্তু খাইল ; হয়তো তাহা আবার ঘর্ম্মাদির সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল, আবার অন্য স্থলে চলিল। কোন পরমাণু এক মুহূর্ত্তও স্থির নাই, ক্রমাগত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা কি নিজে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে ?—ইহারা তো জড় পদার্থ মাত্র। ইহাদের তৎপরতা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই। এক ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরের যে কি অসীম চেষ্টা, তাহা উপলব্ধি করি। সমস্ত জগৎ এইরূপ অনিমেষ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কি নিজের শক্তি আছে ?—তাহা নহে ; তাহাদের ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই তাহাদিগকে চালাইতেছে। ঈশ্বরের মহাশক্তি সেই সকলের মধ্যে বিরাজ করিয়া যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছে। পরমেশ্বর যদি সেই সকলে না থাকিতেন, তবে ঐ সকল বস্তু নিস্তব্ধ হইয়া যাইত; ঘড়ি

বদ্ধ হইলে যেমন হয়, তাহা অপেক্ষাও নিস্তব্ধ হইত—এমন কি, কিছুই থাকিতনা। এইরূপে বিজ্ঞান অতি অল্প আলোচনা করিয়াই ঈশ্বরের শক্তি কেমন নিগূঢ়ভাবে বুঝিতে পারি; তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট অনুভব করি; ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত আছি, তাঁহা হইতে কণামাত্র বিচ্ছিন্ন নহি, ইহা হৃদয়ে কেমন বিনিবিদ্ধ হয়।

আর একটি কথা;—রসায়ন জানিতে হইলে কোন দ্রব্য কোন্ কোন্ উপাদানের কি কি পরিমাণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও জানিতে হইবে। কেবল মাত্র অজনক (hydrogen) দহক (oxygen) যোগে জল হইল, ইহা স্থূল কথা; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম কথা হইবে এই যে, দুই ভাগ অজনক সহিত একভাগ দহক (oxygen) মিশ্রিত করিলে জল হয়। এই তিন ভাগ সংযুক্ত হইয়া যে জলের বাষ্পরূপে পরিণত হইবে, সেই বাষ্প কেবল দুইভাগ মাত্র স্থান গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি তাহাদের ওজন করিয়া পরীক্ষা করা যায়, দেখিতে পাইব যে, যে দুইভাগ অজনক আছে তাহার প্রত্যেক ভাগ অজনকের ওজন যদি এক কুঁচ হয়, তাহা হইলে দুই ভাগে দুই কুঁচ ওজন হইবে; আর একভাগ যে দহক আছে তাহার ওজন ষোল কুঁচ হইবে এবং ঐ দুই ভাগ অজনক ও একভাগ দহক মিলিত হইয়া যে বাষ্প হইবে তাহার ওজন আঠার কুঁচ হইবে। যদিও তিন ভাগ অজনক ও দহকে দুইভাগ মাত্র বাষ্প হইল, কিন্তু তাহাদের এক পরমাণুও নষ্ট হইল না—কারণ অজনক দহক অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হইল বটে, কিন্তু ওজনে যে আঠার কুঁচ, সেই আঠার কুঁচই হইল। পরিমাণ ও ওজনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে জল প্রস্তুত করিতে পারিবে না। আবার ইহারা যে সংযুক্ত হয়—কি নিয়মে সংযুক্ত হয়? শুদ্ধ অজনক (hydrogen) দুইভাগ ও একভাগ দহক (oxygen) বিশ দিন একটা পাত্রে দাও, কিছুই হইবে না, কিন্তু এক স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎ লাগাইয়া দাও জল হইবে। তবেই নিয়ম এই হইল যে, দুইভাগ অজনক ও একভাগ দহকে বিশুদ্ধ অবস্থায় তড়িৎ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাই হইল হিসাবী কথা; আন্দাজী কথাতে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বিজ্ঞান আলোচনা করিবার কালে তাহাদের নিয়ম সহিত আলোচনা করিতে হইবে, তবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আমরা অনুভব করিতে পারিব।

ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করাই আমাদের বিজ্ঞানালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা অতদূর উন্নত হয় নাই, যাহাদিগের মন পারমার্থিক দিকে ধাবিত হয় নাই, তাহারা কি রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারা কোন উপকারই প্রাপ্ত হইবে না? ঈশ্বরের এরূপ ভাব নহে। তিনি উদারভাবে যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন; যে তাঁহাকে চায়, তাহাকে আপনাকে দান করেন; যে ঐহিক সুখ চায়, তাহাকে ঐহিক সুখ দেন—ক্রমে সে তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া আবার তাঁহারই দিকে ফিরিয়া আইসে। সেইরূপ রসায়ন দ্বারা যে ঐহিক সাহায্য হয় না, তাহা নহে। ইহার দ্বারা ঐহিক উপকার বিস্তর হয়। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা যে কত শিল্প প্রস্তুত হইতেছে বলা যায় না; রসায়নশাস্ত্রের বিলোপ হইলে তাহার কিছুই থাকে না। ইহার এক সহজ দৃষ্টান্ত দেখ—সূর্য্যালোক দ্বারা ছবি তোলা। প্রথম কাচকে কলোডিয়ম দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়, তাহার পরে তাহাকে (কাষ্টকি) নাইট্রেট অব সিলবর এর জলে ভিজাইয়া লইলে মানুষ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে মানুষের ছায়া যেখানে পড়ে সেই স্থান ক্ষয় হয় না, যেখানে যেখানে আলো পড়ে, সেই সেই স্থান ক্ষয় হইয়া যায়—ইহাতেই মানুষের প্রতিবিম্ব কাচে দাঁড়াইয়া যায়।

কাপড় রঞ্জিত করিবার রং ধাতু হইতেও প্রস্তুত হয়, বৃক্ষ হইতেও হয়। নীল রঙ্গ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু নানা কৌশলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা বাহির করিতে হয়। আমাদের এখানে খনি আছে, তাহা হইতেই হীরক নীলকান্ত মণি প্রভৃতি পাই, বিলাতে তাহা পাওয়া যায় না অথচ এ সকল না হইলে শোভা হয় না, সুতরাং বিলাতবাসীরা কৃত্রিম উপায়ে তাহা প্রস্তুত করে, যদি চ তাহা স্বাভাবিক হীরকাদির ন্যায় অবিকল হয় না—ইহা ঈশ্বরের নিয়মে হয়, আর তাহা মানুষের নিয়মে হইতেছে—তবুও অনেকটা ঠিক করিয়া উঠিয়াছে; ক্রমে ইহা অপেক্ষাও ভাল প্রস্তুত করিতে পারিবে। এই ব্যবসায়ের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে, আবার কত লোকের বেশ-ভূষার সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। আর এক প্রকার ব্যবসা চলিতেছে—ছাঁচ তোলার ব্যবসা। মনে কর, ঐ কুঁজটীর ছাঁচ তুলিবে। যদি তাহার ছাঁচ তুলিতে হয়, উহার অর্দ্ধেকের উপর তামার জলের * প্রলেপ দিবে, পরে অপর অর্দ্ধেকের উপর প্রলেপ দিবে; সেই দুই অর্দ্ধেক ছাঁচ সংযুক্ত করিলেই কুঁজার

* অম্ল পদার্থের সম্মিশ্রণে গলিত তাম্র। ইহা কোন বস্তুর উপর ঢালিলেই তাহা ঘন সংযুক্ত হইয়া যায়।

সম্পূর্ণ ছাঁচ উঠিল। এই ব্যবসায় প্রকৃতরূপে রসায়ন বিদ্যার ফল। মনে কর, কাচের ব্যবসায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কাচের বদলে স্ফটিক ব্যবহার হইত। খনির ভিতরে যেমন অন্যান্য সামগ্রী থাকে, তেমনি কাচের মতন স্বচ্ছ প্রস্তর অনেক পাওয়া যায়। আর এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে কাচও প্রস্তত হইত, কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে হইত। এখন বিশ চল্লিশ প্রকারের কাচ প্রস্তুত হইতেছে; যন্ত্রের দ্বারা তাহাকে কাটিয়া বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। গিল্টি ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক ব্যাপার। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যাহারা ভোগবিলাসী তাহাদের পক্ষে সুখকর দ্রব্য ব্যয়েতেও অল্প, আবার তাহাতেই অন্যেরও জীবিকা হয়। আমাদের দেশে স্বর্ণকারেরা রসায়নের নিয়ম মাত্র জানে। সোনা গালাইতে হইবে—তাপ দিতেছ, গলিতেছে না, একটু সোহাগা দিতেই গলিয়া গেল; "পান" ধরাইবার সময় সোরা ও নিশাদল উপযুক্ত ভাগে দিলে জোড়া লাগিয়া যায়—অন্য কোন আটা দিলে সেরূপ যোগ হইত না। এই সকল রসায়ন-কথা বরাবর চলিয়া আসিতেছে তাই তাহারা অভ্যাসবশতঃ জানিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এখন আর আমাদের দেশে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা নাই, সুতরাং ইহার আর উন্নতি হইতেছে না; পূর্ব্বে রসায়ন বিজ্ঞান যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহাই আছে; বরঞ্চ তাহা অপেক্ষাও কমিয়া গিয়াছে বলিতে পারি।

চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও রসায়ন দ্বারা কত উপকার হইয়াছে। অসভ্যাবস্থায় যেন ধাঙ্গড় প্রভৃতি বন হইতে একটা গাছের কতকগুলি পাতা খুঁজিয়া লইয়া আসিল, আর একটা গাছের শিকড় লইয়া আসিল, ঔষধ লইয়া গেল। কিন্তু যেখানে সেই সকল গাছ আছে, সেই স্থানের লোকদিগেরই রোগে তাহা খাটিতে পারে; দূরবর্ত্তী স্থান হইলে পাতা প্রভৃতি আনিতে শুকাইয়া গেলে আর তাহাতে কাজ হয় না। এই জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের সত্বটা বাহির করিয়া লওয়া গেল। অনেক পাতা শিকড় খাইলে যে উপকার হয়, তাহার দশ ফোটা খাইলেই সেই উপকার হয়। সত্ব দ্বারা ঔষধের রাগ হয়, তেজ হয়; এইরূপ বলবান্ ঔষধ প্রস্তুত না হইলে নিমের পাতা, গুলঞ্চের পাতা প্রভৃতি ঔষধদ্রব্য অনেকটা খাইতে হইত। আরও

এই সব প্রস্তুত করিবার প্রণালী দ্বারা সার ভাগ লইয়া অসার ভাগ পরিত্যাগ করা গেল; তাহাতে দূর দূর স্থানে পাঠাইবার সুবিধা হইল; চিকিৎসকদের ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হইল; রোগীর ঔষধ খাইবার সুবিধা হইল; বিক্রয়ের সুবিধা হইল। লৌহঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে লৌহের সঙ্গে দহক (oxygen) যোগ করিয়া লৌহভস্ম করা হইল; তখন তাহা উদরে গিয়া পরিপাক হইয়া ঔষধের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহা না করিয়া যদি লৌহ গিলিয়া খাওয়া হয়, তাহাতে রোগের আরো বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ আমাদের দেশে তামাঘটিত, লৌহঘটিত, রূপাঘটিত, সোনাটিত, ঔষধ আছে। অমুক অমুক পদার্থের সঙ্গে অমুক অমুক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহার সঙ্গে দহক মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখে। আমাদের দেশে এইরূপে যতদূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়াছিল; তাহার পরে নানা কারণে আর বেশী চর্চ্চা হয় নাই, উন্নতি হয় নাই। ইংরাজদিগের কত রকম লৌহঘটিত ঔষধ আছে,—হীরাকস বা গন্ধিম লৌহ (সলফেট্ অব আয়রণ) আছে, লৌহের দগ্ধীন (অক্সাইড অব আয়রণ) আছে, লৌহের শঠিম (সাইট্রেট্ অব আয়রণ) আছে, আরো কত রকম আছে; এক লৌহকে নানাপ্রকার রূপান্তরিত করিয়াছে—এক এক রূপে এক এক রকম গুণ। দেখ, রসায়ন শাস্ত্রের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের কত উপকার হইয়াছে।

এই রসায়ন শাস্ত্রকে জানিতে হইলে ইহার সঙ্গে যে যে শাস্ত্রের যোগাযোগ আছে তাহা আগে জানিতে হইবে। তাহা না হইলে রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে তাহাদের কোন কথা পড়িলে তখন হাতড়াইতে হইবে। যেমন, তাপ আগুন হইতেও পাওয়া যায়, সূর্য্য হইতেও পাওয়া যায়—উহাদের সম্বন্ধেও বিস্তর কথা আছে; কোন্ বস্তুতে কি পরিমাণ তাপ দিলে কঠিন বস্তু তরল হয়, তরল বস্তু বায়ু হয়, বায়ু আবার কত তাপে কত প্রসৃত হয়; আবার সেই তাপ কত হরণ করিলে বস্তুর কত সঙ্কোচ হয়, বায়বীয় পদার্থ তরল হয়, তরল পদার্থ কঠিন হয়; কি পরিমাণ তাপ দিলে জলে বিকর্ষণ হইয়া জল বায়ু হইয়া আকাশে প্রসৃত হয়, কি পরিমাণ তাপ প্রত্যাহার করিলে তাহারা আকৃষ্ট ও সংকুচিত হইয়া জল হয়, তাহা হইতে আবার কত তাপ হরণ করিলে সেই জল কঠিন হইয়া তুষার হয়, এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় পূর্ব্বে জানা উচিত। দেখ

এক তড়িতের দ্বারা বিদ্যুৎপাত হইতেছে, আবার তারে সংবাদ যাইতেছে, কত দূর হইতে কত দূরে কত শীঘ্র দহক ও অজনক মিলিয়া জল হইতেছে। আমাদের শরীরে তড়িৎ আছে বলিয়া কথা কহিতে পারিতেছি তড়িৎ আছে বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। সেই তড়িৎ কখন গুপ্তভাবে শরীরে আছে, কখন প্রকাশভাবে বিদ্যুৎ হইতেছে। আবার আকর্ষণ বিকর্ষণের বিষয় জানিতে হইবে। একটা গোলা ছাড়িয়া দিলাম, টেবিলের উপর পড়িল, আবার উপর দিকে যাইবে; প্রথম হইল আকর্ষণ, দ্বিতীয় হইল বিকর্ষণ। এই দুই ক্রিয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আকর্ষণ না বুঝিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বুঝা যায় না। আকর্ষণ বিবিধ প্রকার—যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ; ইহার বিপরীত বিকর্ষণ। আকর্ষণে সংঘট্টন হয়, বিকর্ষণে বিঘট্টন হয়।

জল এক শ্রেণীর পদার্থ। তরল পদার্থের নিদর্শন হইতেছে জল। কঠিন পদার্থ তাহা, যাহার পরমাণু সকলকে শীঘ্র সরান যায় না। তরল পদার্থ চাপা যায়; আঙ্গুল তাহার ভিতরে বসিয়া যায় অর্থাৎ আঙ্গুল যত স্থান গ্রহণ করে, তথাকার পরমাণু সকল সরিয়া গিয়া অন্যত্র ততস্থান গ্রহণ করে, আবার আঙ্গুল টানিয়া লইলে গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া যায়। বায়বীয় পদার্থ সকল ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে। হাল্‌কা সূক্ষ্ম বায়ুবৎ পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণ বলবান্; তাহাদের পরমাণু সকল যতক্ষণ বায়বীয় ভাবে থাকে, ততক্ষণ পরস্পর হইতে দূরেই যাইতে চায়। রসায়নবিজ্ঞান জানিবার পূর্ব্বে জলজাতীয় যত পদার্থ, বায়ুজাতীয় যত পদার্থ, সকলেরই বিষয় জানিতে হইবে—তৈল জল জাতীয় পদার্থ, পারদ জলজাতীয় পদার্থ। বায়ুর বিষয় জানিতে হইলে কেবল সামান্য বায়ুর বিষয় জানিলে হইবে না; দহক (oxygen) একরকম বায়ু, অজনক (hydrogen) একরকম বায়ু—আবার এই সকল বায়ু যে কেবল মুক্ত ভাবে আছে তাহা নহে ইহারা বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায়ও আছে। *

৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* এই প্রবন্ধটী পূজ্যপাদ ৺ হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ২ বৈশাখ রবিবার ১৭৯৫ শকে লিখিত। ইহা তাঁহার "আণবিক ক্রিয়া" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীর একাংশ মাত্র। এই সামান্য অংশটুকু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমগ্র প্রবন্ধাবলী "পুণ্য" পত্রে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। পুঃ সং

আসামী ভাষা। *

আসামী ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার উপভাষা কি স্বতন্ত্র ভাষা, বহুকাল হইল এই তর্কের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সালের শ্রাবণ মাসের "ভারতী" পত্রে কোন লেখক 'ভাষা বিচ্ছেদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এই পুরাতন তর্ককে নবীন ভাষার নবীন আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নবজীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝা যায় যে উক্ত লেখক উড়িয়া ও আসামী ভাষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন। তিনি আসামী ভাষা সম্বন্ধে ব্রাউন প্রণীত পুরাতন একখানা আসামী ব্যাকরণ হইতে চয়ন করিয়া, এবং দুএকটী উড়িয়া বক্তৃতা হইতে উড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া 'ভাষা বিচ্ছেদ' প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন বোধ হয়।

ভারতীর লেখক আসামী ভাষাকে বাঙ্গলার 'উপভাষা' বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ও উড়িয়ার যে প্রভেদ, সে প্রভেদ সূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে প্রভেদ, বাঙ্গালার সহিত আসামীর প্রভেদ তাহা নহে।" লেখক যে কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন জানি না। অপিচ কি কি লক্ষণ দ্বারা ভাষার প্রভেদ বুঝা যায়, তিনি সে গুলির বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে গভীর সন্দেহ হয়।

তিনি যে দুইটী স্বকপোলকল্পিত স্বতঃসিদ্ধের উপর দাঁড়াইয়া ভাষাবিচ্ছেদ নামক প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এইঃ—

---

* বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার মিলন প্রার্থনীয় হইলেও গায়ের জোরে কাহারও মাতৃভাষা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায় না। আসামবাসীরা যদি স্বয়ং স্বীকার করিতেন যে বাঙ্গালা ও আসামীভাষা এক তাহা হইলে ত কোন গোলই ছিল না। কিন্তু যখন তাঁহারাই ইহা স্বীকার করিতে নারাজ তখন উহাকে অভিন্ন বলিতে যাওয়া বৃথা। তবে আন্দোলন ও আলোচনায় অবশ্য সত্য স্ফুটতর রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পুঃ সং

(১) আসামী আর উড়িয়া ভাষা বাঙ্গালার উপভাষা। তাহারা স্বতন্ত্র ভাষারূপে গণ্য নহে। (২) ইংরাজরাজ ভেদ নীতি অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষাকে আসাম আর উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এই দুই সূতঃসিদ্ধ যে অমূলক তাহা সাহস পূর্ব্বক বলা যায়। আসামী ভাষা যে বাঙ্গলা ভাষার অপভ্রংশ বা উপভাষা নহে তাহা দেশীয় এবং বিদেশীয় ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আলোচনা ও গবেষণার অগ্নিপরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। লেখক এই সকলের বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া মনে করিয়াছেন, বুঝি গবর্ণমেণ্ট দুই একজন খৃষ্টান মিশনারীর সাহায্য লইয়া কূট রাজনীতির কারণে এই ভাষা-বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন। আজ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ আসাম দেশে আসামী আর ইংরাজী ভাষায় এই বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত আর পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে সে গুলি আলোচনা করিলে তাঁহাকে এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়িতে হইত না। তিনি আসামী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পরিত্যাগ করিয়াও যদি ভাষাবিৎ গ্রীয়ারসন, সাইস, কাষ্ট্, ব্রন্সন, নিকলস্ প্রভৃতি পণ্ডিতের আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্য-প্রতিপাদক ইংরাজী পুস্তক এবং প্রবন্ধ গুলিও পড়েন তাহা হইলেও তিনি তাঁহার ভ্রম সহজেই দেখিতে পাইবেন আশা করা যায়।

লেখক অজ্ঞতাশতই বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট ভেদনীতি অবলম্বনে আসাম হইতে বাঙ্গলাকে নির্ব্বাসিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ভ্রমমূলক চেষ্টার ফলেই যে আসামে বাঙ্গলা ভাষা প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, আর দেশীয় লোকের সুযুক্তিমূলক চেষ্টাতেই যে পরে গবর্ণমেণ্ট নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে বঙ্গদেশের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার সে কথা জানা নাই বোধ হয়।

স্যর জর্জ ক্যাম্বেল যখন বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন, যখন আসামে চিফকমিশ্নার পদের সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে আসাম দেশের স্কুল সমূহে বাঙ্গলা ভাষা বা আসামী ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত, এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক ও আন্দোলন হইয়াছিল। স্যর জর্জক্যাম্বেল প্রথমেই আসামী ভাষা প্রচলনের বিরোধী হন। অবশেষে দেশহিতৈবী শিক্ষিত আসামবাসিগণ আসামী ভাষায় সুপণ্ডিত আমেরিকান মিশনরীদের সহিত যোগ দিয়া দেশে তুমুল আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে সক্ষম হন যে আসামী ভাষা বাঙ্গলার

উপভাষা নহে। হিন্দী, বাঙ্গলা প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন ভাষা। শিবসাগরে আমেরিকান মিশনরীরা অতি আগ্রহ ও যত্নের সহিত আসামী ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিহাস, গল্প, অভিধান প্রভৃতি ভূরি ভূরি পুস্তক, আর অরুণোদয় নামক অতি উচ্চদরের একখানা পত্রও আসামী ভাষায় প্রচার করিয়া আসামী ভাষার অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের মার্শমেন, কেরি প্রভৃতি মিশনরীদের কাছে বাঙ্গলা ভাষা যে প্রকার ঋণী, শিবসাগরের আমেরিকান মিশনারীদের নিকটেও আসামী ভাষা সেই রকম ঋণী। ১৮৮২ সনের গবর্ণমেণ্টের সেন্সস রিপোর্টের সার মর্ম্ম একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ আসামী ভাষাকে বঙ্গভাষার অপভ্রংশ মাত্র বলিতে অভ্যস্ত ছিলেন। * * * দেশ হিতৈষী শিক্ষিত আসামবাসীগণ ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শিবসাগরবাসী মার্কিন মিশনরীদিগের সাহায্যে পরিশেষে জয়লাভ করিয়াছিলেন। * * * বঙ্গভাষা ও আসামী ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত বিস্তর প্রভেদ আছে। বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্রিয়ারূপ ও বিশেষতঃ তদন্তর্গত বর্ত্তমান ও অতীত কালের প্রয়োগ, এবং রচনাপ্রণালী ও পদসন্নিবেশ প্রভৃতি নানা বিষয়ে উভয় ভাষার মধ্যে অনেক গুরুতর প্রভেদ দৃষ্ট হয়।"

আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে ভারতীর লেখক অনেক কথা অনুমানবশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন। ১৮৯৬ সালের জুলাই মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রে "আসামী ও বাঙ্গালা ভাষা" নামক প্রবন্ধে সিভিলিয়ান মিষ্টার জে, ডি, এণ্ডারসন সাহেব, নব্যভারত পত্রের বাঙ্গালী লেখকশ্রীযুক্ত কালীগোপাল রুদ্রকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভারতীর লেখককে পড়িতে অনুরোধ করি। উক্ত প্রবন্ধে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত উক্তি গুলির যাথার্থ্য প্রতিপদে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন—"officials have assuredly no quarrel with the people of Goalpara, because they persist in speaking much the same Bengali idiom as the rustics of adjacent Rungpore, or with the people of Sylhet and Cachar because their Bengali speech is much the same

as that of the adjoining districts of Mymensing and Tippera. On the contrary it was long before they could be brought to believe that the Assamese tongue was not a mere dialect of Bengali."

এণ্ডারসন্ সাহেব উক্ত প্রবন্ধের অন্যত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আসামবাসী হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও নির্জ্জীব ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে নাই এবং তাঁহাদেরই ভাষা আসামী ভাষা; আসামী ভাষা মুসলমানদিগের সংস্পর্শ রহিত হিন্দুদিগের ভাষা।" *

লেথক আসামী ভাষাকে, কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য ও দেশীয় ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'উপভাষা' বলিতে সাহসী হইলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। আসামী ভাষা এবং বাঙ্গালা ভাষার দুই একটী শব্দ তুলিয়া উহাদিগের একত্ব বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া, তাঁহার

---

* In any case Assamese, though its Vocabulary is chiefly Prakrita has the idioms of a race whose social customs differ widely from those of the Bengali and are essentially those of a Hindu race who has not adopted Mussalman social habits." "It is characteristic of the reaction that it should find, in the official recognition of the seperate existence of Assamese an interested attempt to discredit the social system of Bengal. The plain truth is far otherwise. It is the Hindus of Assam who maintain that their Language and their custom should be recognized and supported."

* The Assamese claim, not without reason to speak a language unaffected by Christian or Moslem influences, a language reflecting the primitive forces of a Hinduism which still sufficientley flexible to grow and to make converts. Its syntax is still redolent of a premitive and even savage past. But it has a literature which is entirely indigenous."

অন্য কোন উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন উচিত ছিল। আসামী ভাষাকে 'উপভাষা' প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার উপরে, আসামী ভাষা আর বাঙ্গালা ভাষার শব্দ তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখাইয়া আসামী বাঙ্গালা ভাষার অপভ্রংশ কিম্বা বাঙ্গালা আসামী ভাষার অপভ্রংশ বলা ভাষাবিদের উপযুক্ত কাজ নহে। মেক্সমূলার বলেন ;—"It matters not how many words may be derived in common from another language it does not prove the identity of any two dialects. It is to the Grammer that we must look, to decide their indenty." অধ্যাপক সেসও এই কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। ভারতীর লেখকের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াই তো স্কটলণ্ডের ফিলজফার ডিউগাল্ডষ্টুয়ার্ট প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন, যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যটা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য গ্রীক ও লাটীনের ছাঁচে কৌশলে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কষ্ট আসামী ভাষা সম্বন্ধে বলেন ;— "It is laden with sanskrit loan-words but the Grammar of the Assamese is quite different from Bengali, as far apart as Italian and French from each other." অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়া আসামী ভাষার পরিপুষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইটালীয় ও ফরাসি ভাষার পরস্পরের পার্থক্যের ন্যায় বঙ্গভাষা ও আসামী ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ গত পার্থক্য বিশেষ ভাবে বিদ্যমান।

ভারতীর প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন, "আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাঙ্গালা পরাভবের কোন আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালী ভাষীর জন সংখ্যা ভারতবর্ষের অপর ভাষীর:তুলনায় অধিক। প্রায় পাঁচ কোটী লোক বাঙ্গালা বলে।" বাঙ্গালা ভাষার দেহটা বড়, উদরটা বড়, মুখ ব্যাদানটা বড়, ক্ষুধাটা বড় হইতে পারে, হজম করিবার ক্ষমতাও অধিক হইয়াছে বলিয়াই কি বাঙ্গালী লেখক আসামী ভাষাকে উদরস্থ করিতে চাহেন? ইহা যে অতি ভয়ানক নীতি। লেখক দর্পভরে বলিতেছেন "এক্ষণে ভারতবর্ষে বাঙ্গালা ছাড়া বোধ হয় এমন কোন ভাষাই নাই, যে ভাষার আধুনিক সাহিত্য ইংরাজী শিক্ষিত এবং ইংরাজী অন-

ভিজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই সজাগ ঔৎসুক্য * * * ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্রের রচনা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে বাঙ্গালা সাহিত্য অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে আমাদের সাহিত্য এমন একটি সবেগতা, এমন একটি প্রবলতা লাভ করিয়াছে। বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যে দেশ দিয়া যায় সে দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে, বাণিজ্যে ও ধনে ধান্যে ধন্য হইয়া উঠে তেমনি ভারতবর্ষে যতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপ্তি হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই উপকূলকে নিত্য নব নব ভাবে সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবে। সেইজন্য বলিতেছিলাম আসাম ও উড়িষ্যায় বাঙ্গলা যদি লিখন পঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে, তেমনি সেই দেশের পক্ষেও।" ইহার উত্তরে আমরা আর কিছুই না বলিয়া সুবিখ্যাত বাঙ্গালা লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—"অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাষার খুব উন্নতি হইয়াছে, পক্ষান্তরে সাহিত্য সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ তথা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি মহাশয়েরা বলেন যে আধুনিক বাঙ্গালা লেখকেরা বড়ই ভুল বাঙ্গালা লেখেন। * * * এখনকার বাঙ্গলা লেখকদের সংখ্যা করা দুষ্কর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত যে বাঙ্গলা লেখা বাহির হইতেছে তবু বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন কি উন্নতি হইয়াছে তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। ঘোষ মহাশয়ের এবং বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিযোগ সমূলক হইলে লেখকদের অধিকাংশই মোটে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না। তবু কি মানিতে হইবে যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কিম্বা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষার উন্নতি বলিলে বা সাহিত্যের উন্নতি বলিলে কি বুঝা যায়? রচনা নানা প্রকারেরই হয়। যথা;—ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি। কিন্তু তত্তৎ নামধেয় কতকগুলা পুস্তক কোন ভাষাতে রচিত হইলেই সে ভাষার সাহিত্য সমৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে কি? বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপান ইতিহাস, গণিতাদি নামে খ্যাত বহুতর পুস্তকই তো হইয়াছে। সে গুলি পাশ্চাত্য সাহিত্যের গৌরবের সাক্ষী বটে; কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের কি? * * * আমি বলি যে যখন অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

হয় নাই, অভিধান হয় নাই, বানানের বিধি ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির কথা উপহাসের বিষয় হয় না কি ? শিশুর আধো আধো ভাষে ভাষার উন্নতি হওয়া কেহ বলে না, বাঙ্গালা ভাষারও এখন আধো আধো ভাব মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার এখনও নিতান্ত শৈশব দশা। বাঙ্গালা ভাষা আকৃতি অবয়বেও যেমন শিশু বয়সেও তেমন শিশু। এই ইংরাজদেরই আমলে পাদ্রিদের পত্তন করিবার পূর্ব্বে এখানকার বাঙ্গলা ভাষার জন্ম হয় নাই বলিলে দোষ হয় না। পাদ্রিতে কাহারও আপত্তি থাকিলে না হয়, রাম মোহন রায়ের নাম করিতে আমিও রাজী হইতে পারি। ভাষার অবস্থা বিচারে এ তো সে দিনকার কথা। এই সময়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন সংশোধন, উৎকর্ষ বা উন্নতি এই মাত্র হইয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষা বাক্যরচনা বিষয়ে দিন দিনই বেগে বিলাত পানে ঠেলিয়া যাইতেছে। দৈব দুর্য্যোগে যদি আমাদের বিলাতী বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়, আর ধরো যে চীনের সঙ্গে সেই সম্পর্ক পাতানো যায়, তাহা হইলে তদবধি পঞ্চাশ বৎসর পরেই তোমার আমার এই বাঙ্গালা ভাষাতে বাহুল্যরূপেই "কুচুঙ্গচুঙ্গ" দেখিতে পাইবে। * * * বাঙ্গালা মিশ্র ভাষা। আটপহুরে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের তত বাড়াবাড়ি নাই; সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি আজি কালকার পোষাকী বাঙ্গালা ভাষাতেই হইতেছে। আটপহুরে বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক ভাষারই দাবি দাওয়া আছে; অনেকের দাবির পরিমাণের তারতম্যও তত বেশী নয়। এমন অবস্থায় কাহার ব্যাকরণ মানি বলুন দেখি ? আটপহুরে বাঙ্গলা, নবাবী আমলের বাঙ্গলা, খাঁটী মুসলমানী বাঙ্গলা, বৈষ্ণবী বাঙ্গলা, খাঁটী সংস্কৃত বাঙ্গলা, আর ইদানীন্তন খিচুড়ি বাঙ্গলা, এতগুলি রকম রকম বাঙ্গলাকে বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। রকম রকম এতগুলি ভাষার পুস্তকাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।"

আমাদের মাতৃভাষা আসামী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিতে পরামর্শদাতাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত বিভাগের কোন্ বাঙ্গলা ভাষাকে আমরা গ্রহণ করিব ?

আসাম আর উড়িষ্যা দেশের প্রতি বাঙ্গালী লেখকদিগের বড় বেশী মাত্রায় দয়া দেখা যায়।

সেদিন একজন উড়িষ্যাবাসী ষ্টেট্‌সম্যান পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা

হইতে এইটুকু তুলিয়া দিলাম *। লেখক আসামীদিগকে বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিবার জন্য এই যুক্তি দিয়া বলিতেছেন—"দেশীয় সাহিত্যের একমাত্র ভরসা তাহার প্রজা সংখ্যা, তাহার লেখক ও পাঠক সাধারণের ব্যাপ্তি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেশে কখনই মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না।" এই যুক্তি কি ঠিক এই ধরণের নয় যে তোমার বাড়ীতে তোমার সন্তান সন্ততি সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাহাদের কখনো জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কি বড়লোক হইবার সম্ভাবনা নাই; আর আমার বাড়ীতে অনেক ছেলে, বলিয়াই কি তাহারা বড়লোক হইবে। অতএব তোমার সন্তান সন্ততিরা দুর্ব্বল বলিয়া কি তাহারা আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমার পদতলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে? মহৎ সাহিত্য জন্মিবে বলিয়াই যে শুধু কেহ নিজ ভাষাকে ভালবাসে এমন নহে, এবং অল্প লোকজনের কথিত সামান্য ভাষা কালক্রমে মহত্ব লাভ করিয়া উঠার কথাও ইতিহাসে বিরল নহে। লেখকের যদি আসামী সাহিত্য জানা থাকিত তাহা হইলে, আসামী ভাষাতে মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না, এ কথা বলিতে পারিতেন না। যে আসামী ভাষায় বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্টি হইবার চারি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রামায়ণাদি গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়া ভাষাবিৎ গ্রীয়ারসনকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেই ভাষাতে যে মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না এমন কথা বলা 'ভাষা বিচ্ছেদ' প্রবন্ধ লেখকেরই শোভা পায়। ইংরাজ রাজের সুশীতল ছায়ায় ভারতবর্ষের প্রধান নগরী কলিকাতার বিপুল সাহায্য লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা তাড়াতাড়ি ধনী ও বিক্রমশালী হইয়া উঠিয়া, আসামী ভাষাকে উপভাষা আদি নামে অভিহিত করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? আসামী ভাষা বুনিয়াদী ভাষা। বুনিয়াদী গৃহস্থ পরিবারকে প্রতিবাসী

* During Orissa Famine in 1866—Sir Alexander Mackenzie in Bengal secretariat—it was about this time Oriyas were savedfrom the worst type of gagging which selfish humanity ever devised. I mean the strenuous and combined attempt made by interested Bengalis to ostracise the Oriya language from schools and courts and introduce Bengali in its stead."

কোন হঠাৎ নবাব যে চক্ষে দেখে, কোন কোন বঙ্গীয় লেখকেরাও আসামী ভাষাকে সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তবে সব বাঙ্গালীই 'ভাষা বিচ্ছেদ' লেখকের মত নহেন ইহাই সুখের বিষয়। প্রমাণ স্বরূপ ১৮৯৭ সালের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরীয়ানের রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইনি এক জন অতি উচ্চদরের পণ্ডিত ও শিক্ষিত বাঙ্গালী। আসামী ভাষা বাঙ্গালা ভাষার শাখা নহে। আসামী ভাষা যে স্বতন্ত্র ভাষা তাহা যুক্তি ও প্রমাণের উপর দৃঢ় রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। *

ভারতীর লেখক বলেন "আসামী এবং উড়িয়া বাঙ্গালার যদি সগোত্র ভাষা না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার কোন অধিকার থাকিত না।" লেখক সগোত্র অর্থে কি বলিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দী, বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, আসামী, উড়িয়া সকলেই যখন সংস্কৃত ভাষার প্রশাখা, তখন সকলেই সগোত্র। লেখক যে হিসাবে আসামী ও উড়িয়া ভাষার উপর স্বত্ব স্থাপন করিতে যাইতেছেন, সেই হিসাবে হিন্দী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর দাবী দাওয়া কি চলে না? তবে সেই গুলিকে ছাড়িয়া আসামী আর উড়িয়াকে তাঁহার ধরিবার অর্থ কি?

---

* Assamese is never a dialect of Bengali, and its claims to be regarded as a separate language are extremely strong and valid. Since the separation of Assam from the Liutenant Governorship of Bengal an indomitable movement has been set up in that Province which has been for the last few years doing its best to give Assamese a character quite distinct from Bengali and in that noble and laudable attempt they have succeeded beyond all expectations. The movement is the offspring of a true and pure patriotism, and in the opinion of those most competent to judge, is calculated to do permanent and infinite good to the people of Assam. Its promoters moreover look upon Bengalis living in Assam as foreigners (they rightly think so), and thereby they have created an estrangement between themselves and their equally advanced neighbours, for which patriotic act the Assamese are quite justified."

লেখক উড়িয়া ভাষায় লিখিত একটী ক্ষুদ্র কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন —"কোন বাঙ্গালীকে ইহার অর্থ বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।"

সংস্কৃতমূলক ভারতবর্ষের সকল ভাষার ভাষীরাই পরস্পরের লিখিত ভাষার কিছু না কিছু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম। কারণ, অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ সব ভাষারই সাধারণ সম্পত্তি এবং পদ, বিভক্তি, বাক্য প্রভৃতি প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। একটা হিন্দী ভাষার পুস্তক হইতে এক পেরাগ্রাফ উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিলে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কে আছে যে তাহাকে তাহার মোটামুটি মর্ম্ম বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে? আর্য্য বাঙ্গালি, আর্য্য হিন্দীভাষা, কি উড়িয়া ভাষা, কি আসামী ভাষার কোন একটা লিখিত প্রবন্ধের মোটামুটী ভাবটা বুঝিতে না পারাটাই বরং অস্বাভাবিক।

লেখক ডাক্তার ব্রাউন প্রণীত আসামী ব্যাকরণ হইতে উচ্চারণ সম্বন্ধে একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া নিজ মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এই রকম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে, ভাষা বিজ্ঞানের অন্ততঃ চলনসই জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। আর যে ভাষার উপর মত ব্যক্ত করিতে যাওয়া যায়, সেই ভাষাও অন্ততঃ মোটামুটি জানা চাই। লেখক কাহার কাছে শিখিলেন যে মূর্দ্ধণ্য 'ষ' আসামী ভাষায় "খ"র ন্যায় উচ্চারিত হয়, আর হিন্দুস্থানীর সঙ্গে শুধু এইটিই মিল? শুধু মূর্দ্ধণ্য 'ষ' কেন, দন্ত্য 'স' তালব্য 'শ' আর মূর্দ্ধণ্য 'ষ' তিনটিরই আসামীতে উচ্চারণ এক, উহা "খ" র মত কদাচ নহে। আর যে দুই একটা উদাহরণ লেখক দেখাইয়াছেন তাহাও ভুল। 'স্মরণকে' আসামী ভাষায় "স্মরণ" আর "পক্ষীকে" "পক্‌খী" বলেনা। স্মরণ শব্দের পরিবর্ত্তে আসামী ভাষায় চলিত ব্যবহারার্থে অন্য শব্দ আছে, কিন্তু "স্মরণ" বলিতে হইলে "সুমরণ" বলে, আর "পক্ষী"কে "চরাই বলে। লেখক ব্রাউন প্রণীত সেকেলে ভ্রমপূর্ণ ব্যাকরণ হইতে সাহায্য লইতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। "স্বরূপ" কেও "সরূপ" বলে না। স্বরূপের জায়গায় "নিচিনা" ব্যবহৃত হয়। ইচ্ছা হইলে আদত "স্বরূপ" কথাই ব্যবহার করা যায়। আসামীতে "পাওয়া" কে "পবা" বলে না "পোৱা" বলে।

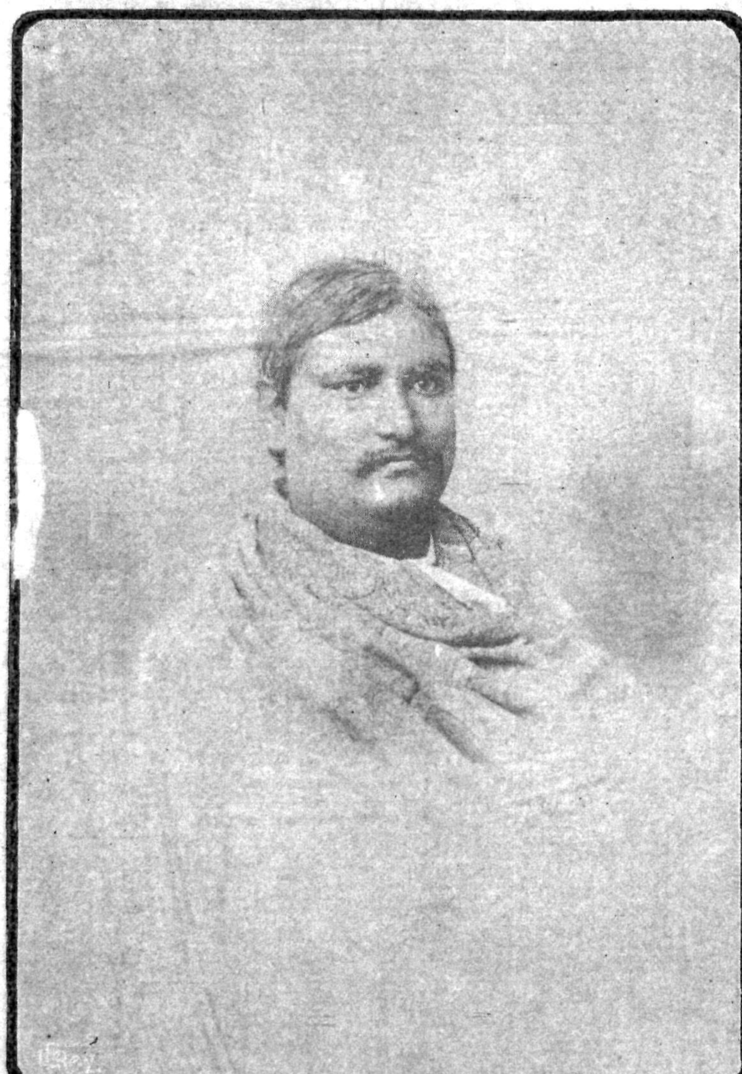
লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার প্রভেদ, বর্ত্তমান কোন কোন য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ভাষাতে দেখিতে পাওয়া যায়; আসামী ভাষার এমনি গঠন যে উহার

লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে প্রভেদ নাই। ভাষার একীকরণকেই লেখক ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একতাস্থাপনের এক মাত্র মহদুপায় ঠাওরাইয়াছেন; লেখকের কথা ঠিক হইলে বাঙ্গালা ভাষী হিন্দু মুসলমান ও হিন্দী ভাষী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথায় কথায় মাথা ফাটাফাটিটা বিরল দেখিতে পাওয়া যাইত এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিচ্ছেদ হইত না। ভারতীয় লেখক শুধু ভাষার একীকরণকেই অনৈক্য ও বিচ্ছেদের সর্ব্বব্যাধিনাশক মহৌষধ (Panacea) স্থির করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালী ও আসামীর আচার ব্যবহারের মধ্যেও অনেক প্রভেদ আছে। জাতীয় পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, সামাজিক আদান প্রদান, প্রভৃতি অনেক বিষয়েই বাঙ্গালা ও আসামে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি আসামীবাসীরা ভাষাবিচ্ছেদ লেখকের ন্যায় বঙ্গীয় লেখকদিগকে এই পরামর্শ দেন যে তাঁহারা আসামীদিগকে আপাততঃ দয়া পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়া স্বজাতির মধ্যে, নিজ পরিবারের মধ্যে, স্বগৃহের মধ্যে যে সব অনৈক্য ও বিচ্ছেদ রহিয়াছে সেই সব নির্ব্বাপিত করিতে সচেষ্ট হউন।

স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও ওয়েলসের লোকেরা নিজ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী গ্রহণ করার কথা যে প্রবন্ধলেখক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এস্থলে প্রযুজ্য হইতে পারে না। বিজিত প্রজা স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও ওয়েলসের সহিত সহিত জেতা প্রবল রাজা ইংলণ্ডের যে সম্পর্ক, আসামের সহিতও লেখক বাঙ্গালার সেই সম্পর্ক দাঁড় করাইতে চাহেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

১৮৯৭ সালে "Ethnography in Assam" এর অনরারী ডিরেক্টর ই, এ, গেইট সাহেব তাঁহার Report on the pregress of Historical Research in Assam এ যাহা লিখিয়াছেন, ভারতীয় লেখক মহাশয়কে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমরা স্থানাভাবে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

জনৈক আসাম বাসী।



শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

পঞ্চ ভূত।

ভূত শব্দ ইংরাজী এলিমেণ্ট শব্দের পর্য্যায়ে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। গ্রীক দর্শনে চারিটি এলিমেণ্টের কথা পাওয়া যায়। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি এলিমেণ্ট। কেহ কেহ পঞ্চম এলিমেণ্ট ঈথার বা ব্যোমের নামও করিয়া থাকিবেন। আমাদের দর্শন শাস্ত্রে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূত মধ্যে গণ্য। সমগ্র জড় জগৎ এই পাঁচ মহাভূতে নির্ম্মিত।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রে এলিমেণ্ট শব্দের প্রয়োগ আছে। এলিমেণ্ট অর্থে জড় জগতের মূল উপাদান, যাহা বিশ্লেষণ করিয়া এ পর্য্যন্ত অন্য কোন পদার্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। রাসায়নিকেরা এ পর্য্যন্ত সত্তরটি বড় অধিক মূল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়িতেছে। জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত সকল পদার্থ এই সত্তরটি মূল পদার্থের পরস্পর যোগে নির্ম্মিত।

রসায়ন শাস্ত্রে এলিমেণ্ট শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়, ভূত শব্দকে সেই অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না? না করিবার কোন কারণ অকস্মাৎ পাওয়া যায় না। একালে যেরূপে রসায়ন শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, সে কালে তেমন হয় নাই। তজ্জন্য বাগ্‌বিতণ্ডার ফল নাই। তজ্জন্য দুঃখিত বা লজ্জিত হইবারই বা প্রয়োজন কি তাহা বুঝি না। অনেকে এই জন্য প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রকারগণকে বিদ্রূপ করেন; এই বিদ্রূপও অযথা প্রযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বিধাতা সৃষ্টির দিনে মনুষ্যকে জাগতিক তথ্যের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন নাই; মানুষ আপন চেষ্টায় কাল সহকারে ঐ সকল তথ্য নির্ণয় করিতেছে। সুতরাং আমরা সেকালের লোকের অপেক্ষা বেশী জানি ইহাতে বিশেষ বিস্ময়ের বা স্পর্দ্ধার কারণ নাই।

কিন্তু প্রাচীন আচার্য্যেরা একথাটা ভাল বুঝিতেন না বা জানিতেন না, এ কথাটা স্বীকার করিতে অনেকের কষ্ট হয়। সেই জন্য তাঁহারা প্রাচীন কালের বিজ্ঞানের সহিত এ কালের-বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিপন্ন করিবার

জন্য উৎসুক থাকেন। এ কালে বলে ভূত সত্তরটি; সে কালে ছিল ভূত পাঁচটি, প্রাচীনেরা রসায়ন শাস্ত্র জানিতেন না মনে করিও না। ভূত শব্দ উভয়ত্র একার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহাই মনে কর। মীমাংসা শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ দাঁড়ায়।

ভূত শব্দ সর্ব্বত্রই এক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে এমনই বা কি কথা? এক রকম ভূত আছে যাহা অতি ভয়ঙ্কর, স্পিরিচুয়ালিষ্ট ব্যতীত অন্যে তাহার ছায়া মাড়াইতে সাহস করে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের সংখ্যা পাঁচও নয়, সত্তরও নয়; অনেক বেশী। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে ভূত শব্দের বিবিধ অর্থ থাকিতে পারে।

মীমাংসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বুঝান। পঞ্চভূত অর্থে জড় পদার্থের পাঁচটি মৌলিক উপাদান বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য্যেরা জড় পদার্থকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন মাত্র। এ এক রকম শ্রেণী-বিভাগ,—ক্লাসিফিকেশন।

অর্থাৎ ক্ষিতি শব্দের অর্থ মাটি নহে, ক্ষিতি অর্থে কঠিন পদার্থ মাত্রকেই বুঝায়। জল অর্থে উদজানঅম্লজানাত্মক পানীয় জলমাত্র নহে, জলের অর্থ তরল পদার্থ মাত্র। এইরূপে বায়ু শব্দ বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই প্রযোজ্য। আকাশ অর্থে ঈথর। তেজ অর্থে তেজোময় পদার্থ মাত্র।

মীমাংসাটা মন্দ নয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বিরোধ এক-বারে যায় না। বিরোধের একটা কারণ—একালের বিজ্ঞানে কঠিন, তরল, বায়বীয় এমন কি আকাশ পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু তেজঃ পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিছু দিন পূর্ব্বে ক্যালরিক, ফ্লজিস্তন, তড়িৎ প্রভৃতি কতকগুলি তেজঃ পদার্থের অস্তিত্ব বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্বীকৃত হইত। কিন্তু তাহারা সকলেই এক্ষণে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া কল্পনার রাজ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখন আর স্বতন্ত্র তেজঃ পদার্থ নাই। বিরো-ধের দ্বিতীয় কারণ ক্ষিত্যাদি ভূতে যে সকল গুণ আরোপিত আছে, কাঠিন্যাদি গুণের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য ঘটে না। দার্শনিকদের মতে এক ক্ষিতিতেই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান। জলে কেবল চারিটি, তেজে কেবল তিনটি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কঠিন ও তরল উভয় পদা-র্থেই পাঁচ গুণই বিদ্যমান দেখা যায়। এইরূপ গোল লাগে। এইরূপ আরও

বিরোধ আছে। আকাশ অর্থে যদি ঈথার হয়, তাহার সহিত শব্দের সম্বন্ধ আধুনিক বিজ্ঞান মানেন না ইত্যাদি।

আমার বিবেচনায় মীমাংসার জন্য একটু অন্য পথে গেলে মন্দ হয় না। দর্শন শাস্ত্রে আমার অধিকার নাই; কাজেই পূরা সাহসে কোন কথা বলিতে পারি না। এবং সংপ্রতি প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়া মত সমর্থনের ক্ষমতাও আমার নাই। ইংরাজী দর্শনে সুপণ্ডিত আমার জনৈক বন্ধু আপনা হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমি জানি। কতকটা সেই সাহসে আমি এই মীমাংসা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। প্রমাণ অনুসন্ধানের ভার পাঠক মহাশয়ের উপর।

আমার মীমাংসার ভিত্তি এই। আমি যতদূর বুঝিয়াছি সাংখ্য, বৌদ্ধ বা বৈদান্তিক সকলেই একালে পদার্থ বিজ্ঞান যে চোখে জড় পদার্থ দেখেন, ঠিক সে চোখে দেখিতেন না। এ কালের মনোবিজ্ঞান যে চোখে দেখে সেই চোখে দেখিতেন। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের যে বস্তুতঃ বিরোধ আছে তাহা নহে। উভয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্ন, কাজেই দৃষ্টির প্রণালী স্বতন্ত্র।

মনোবিজ্ঞানের নিকট জড় পদার্থ বলিয়া স্বাধীন-অস্তিত্বযুক্ত কোন পদার্থই নাই। অবশ্য সকলেই এতদূর যান না। কিন্তু যাঁহারা যান না, অস্তিত্ব প্রমাণের ভার তাঁহাদের উপর; এবং আমার জ্ঞান যতটুকু, তাহার মধ্যে সেই প্রমাণ প্রয়োগে কেহ সমর্থ হইয়াছেন তাহা জানি না।

জড় পদার্থ কতকগুলি অনুভূতির সমবায় মাত্র—ইংরাজীতে বলিলে bundle of sensations বাঙ্গালায় বলিলে রূপরসাদি কতকগুলি গুণের সমবায় মাত্র। এই রূপরসাদি গুণ কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত মনুষ্যাত্মার বহির্ভূত কোন পদার্থের গুণ নহে; উহা মনুষ্যাত্মারই অঙ্গীভূত। দর্শনের স্বীকৃত গুণ পাঁচটি—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—পাঁচটি অনুভূতি বা sensation, ইহা স্থূলতঃ স্বীকার্য্য। এক একটা গুণের সঙ্গে এক একটা ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে। ইন্দ্রিয় শব্দটা সচরাচর শারীরিক যন্ত্র বিশেষের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতে যাহাকে senses বা organs of sensation বলে, ইন্দ্রিয় শব্দ সচরাচর সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমার বোধ হয় এ কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। ইন্দ্রিয় অর্থে একটা দৈহিক যন্ত্র না বুঝিয়া মানসিক শক্তি বিশেষ বোঝা উচিত। ভাল কথা পাইলাম

না,—'মানসিক শক্তি'—faculty—এই শব্দে ভাব বোঝাইবার চেষ্টা করিলাম। অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শেন্দ্রিয় শব্দে কেবল গায়ের উপরের চামড়া খানা, এমন কি কতকগুলি স্নায়ুপ্রান্ত না বুঝিয়া সেই চিত্তবৃত্তিটা বুঝিতে হইবে, যাহার সাহায্যে স্পর্শের বোধ জন্মে। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থে কাণ নহে, বা কাণের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র নহে। শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থে শ্রবণবোধের উৎপাদক চিত্তবৃত্তি বুঝিতে হইবে ইত্যাদি। মনে হইতেছে সাংখ্য বা বৈদান্তিক যেখানে জাগতিক অভিব্যক্তির "দার্শনিক সৃষ্টির" তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন সেখানে ইন্দ্রিয় শব্দ এইরূপ অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কেবল রূপ-বোধ জন্মাইবার ক্ষমতা আছে, রসগন্ধাদির বোধের সহিত এই ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্কই নাই। সেইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কেবল গন্ধানুভূতি উদ্রেকেরই ক্ষমতা আছে, অন্যান্য অনুভূতির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আধুনিক শারীরবিজ্ঞান-সম্মত ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্য। কাজেই যয়টা ইন্দ্রিয়, ততগুলি অনুভূতি বা গুণ। পাঁচটি ইন্দ্রিয়—গুণও পাঁচটি। আর এক একটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এক একটা গুণের বিশিষ্ট সম্বন্ধ। মানুষের পাঁচটার বেশী ইন্দ্রিয় নাই। কেহ কেহ বলেন ছয়টা বা সাতটা; সে সূক্ষ্ম তর্ক, এখানে তোলার প্রয়োজন নাই। গুণও পাঁচটার বেশী নাই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এই পাঁচটা গুণের পরস্পর বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন ভাবে সমবায়ে বহির্জগৎ উৎপন্ন; অথবা আমরা যে কল্পিত জগৎকে বহির্জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা উৎপন্ন। যাহাকে আমরা জড় পদার্থ বলিয়া থাকি; তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতিপয় গুণের সমবায় মাত্র। দুইটা বা তিনটা বা চারিটা গুণ একত্র যোগে এক একটা জড় পদার্থ।

গুণ কয়টাই ইন্দ্রিয়লব্ধ অস্তিত্বযুক্ত সত্য পদার্থ; জড় পদার্থ একটা কল্পনা মাত্র। অমুক অমুক গুণ একত্র দেখিলে আমরা মনে করিয়া লই বা কল্পনা করিয়া লই, অমুক স্থানে এইরূপ একটা জড় পদার্থ আছে। কতকগুলি গুণই আমাদের ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রত্যক্ষ সত্য পদার্থ। আর হাতীটা, ঘোড়াটা, গাছটা, চাঁদটা, তারাটা বিভিন্ন গুণের সমষ্টীভূত কল্পিত পদার্থ মাত্র। বস্তুতঃ হাতীটা ওখানে আছে তাহার প্রমাণ নাই। তবে বৃহল্লম্বিশুণ্ডাদশুসম্বলিত একটা রূপের অস্তিত্ব আমার দর্শনেন্দ্রিয় সাহায্যে অন্তঃকরণের নিকট প্রতিভাত হই-

তেছে এই মাত্র। কেবল একটা রূপই এখানে প্রত্যক্ষ হইতেছে এমন নহে। সময়ে সময়ে একটা বিকট বৃংহিতধ্বনিও শ্রবণেন্দ্রিয় সহকারে উক্তরূপের সহিত সম্মিলিত হইতে দেখি। এবং ঘটনাচক্রে একটা উৎকট স্পর্শ লাভও না ঘটিতে পারে তাহা নহে। এ হেন রূপ-শব্দ-স্পর্শ এই গুণ ত্রয়ের যে সমাবেশ, তাহার নাম দিয়া থাকি কিনা "হস্তী"। পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আমার হস্তীতে রস ও গন্ধেরও অভাব নাই; নতুবা মদস্রাবী হস্তীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনপটু কালিদাসের কবিতাগুলিই ব্যর্থ হইয়া যাইত।

এখন বলনা কেন, ক্ষিতি অর্থে মাটীও নয়, কঠিন পদার্থও নয়, যে যে দ্রব্যে রূপরসাদি পাঁচটি গুণেরই সমাবেশ উপলব্ধ হয়, তাহাদের সকলেরই নাম ক্ষিতি। যাহাতে চারিটি মাত্র গুণের উপলব্ধি হয় তাহার নাম জল ইত্যাদি। এইরূপে জড়পদার্থের দার্শনিক শ্রেণীবিভাগ চলিতে পারে। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রঘটিত কোন দোষস্পর্শেরও সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রেরও সুন্দর অর্থ হয়, বিজ্ঞানেরও সহিত বিরোধ জন্মে না।

প্রাচীন হিন্দু দর্শনে এইরূপ অর্থে মহাভূত শব্দ গৃহীত হইত কি না অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়। আমার বিশ্বাস জন্মাইয়াছে এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। তবে দর্শন শাস্ত্রের সম্যক্ উন্নতির পূর্ব্বে ক্ষিত্যাদি শব্দ সাধারণ মৃত্তিকাদি অর্থে প্রযুক্ত হইত না এমন নহে। অথবা মাটী, জল, হাওয়া প্রভৃতির পরস্পর যোগেই সমুদয় জড় জগৎ নির্ম্মিত, এইরূপ মোটা বিশ্বাস যে কাহারও ছিল না বা কখনও ছিল না, তাহাও মনে করিবার কারণ নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সৌন্দর্য্য ও ঈশ্বরপ্রীতি।

যৌবনের প্রারম্ভে একজন সংসারে বীত রাগ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল তখন লৌহবর্ত্ম ছিল না। সে নানা কষ্টে রৌদ্রে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পিতা মাতার স্নেহ ছাড়িয়া উদাসীনভাবে চলিতে লাগিল। পিতা মাতা জানিতে পারিল না যে পুত্র কোথায় গেল। তাহার সঙ্গে কিছুই ছিল না, কেবল ভিক্ষা করিতে করিতে কাশীতে পৌছিল। তাহার একটী সমবয়স্ক হৃদয়বন্ধু ছিল সেই কেবল জানিতে পারিল যে সে কোথায় গিয়াছে। সেই উদাসীন নির্ধন কিন্তু তাহার এই বন্ধু ধনী, ইহার সঙ্গে অনেকেরই আলাপ পরিচয় আছে। এই বন্ধুটী যদিও সেই সংসারবিরক্ত ব্যক্তিকে সংসার ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিল এবং আপনার বাটীতে তাহাকে রাখিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে কাহারও আশ্রয়ে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া বন্ধুর কথা না শুনিয়াই চলিয়া গেল। বন্ধুটী বুঝিতে পারিল যে প্রকাশ্যে সাহায্য করিলে তাহা গৃহীত হইবে না অথচ দেখিল যে সাহায্য বিনা তাহার প্রাণরক্ষা কঠিন। এই জন্য সে আপনি যে সুখে সুখী ছিল তাহাতে সুখী না হইয়া বন্ধুর দুঃখে দুঃখী হইল। সে তাহাকে সাহায্য করিবার কথা কিছুই বলিল না যেহেতু সে এমন দেখাইতে চাহে না যে ধনের জন্য প্রীতি ; কিন্তু তাহার প্রীতি হৃদয়ের প্রীতি। কাশীতে সেই বন্ধুর একজন সহকর্ম্মচারী ছিল, তাহাকে গোপনে এক পত্র লিখিয়া দিল যে 'অমুক এইরূপে কাশী যাইতেছে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তাহাকে দেখিবামাত্র সাহায্য করিবে এবং আপনার পরিবারের মত করিয়া রাখিবে তাহা হইলে আমাকে বাধিত করা হইবে।' কিন্তু সেই উদাসীন ঐ সকল কিছুই জানিল না ; সে সেই চৌদ্দ পনর দিন অনাহারের পর পীড়াযুক্ত শীর্ণ শরীরে কাশীর অপর পার রামনগরে গিয়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া গেল, এমন শক্তি নাই যে উত্থান করে, এমন পয়সা নাই যে নদী পার হয়। কিন্তু সেই সওদাগরের লোক জন চারি দিকেই রহিয়াছে সর্ব্বদাই অনুসন্ধান লইতেছে যে সেই উদাসীন কোথায় আছে; তাহারা তাহাকে অভীপ্সিত

ব্যক্তি বলিয়া জানিতে পারিয়া সওদাগরের নিকট সংবাদ লইয়া গেল। সওদাগর তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বহু যত্ন ও আদর পূর্ব্বক নৌকা যোগে গৃহে লইয়া গেল। উদাসীন আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, এ ব্যক্তি তাহাকে কেন এত যত্ন করিতেছে। কিন্তু সওদাগরের সেই সহকর্ম্মচারী কোনই কারণ বলিতেছে না, সে জানাইতেছে 'আমি তোমার কষ্ট দেখিয়া দয়া বশতঃ তোমার উপকারের জন্য এ প্রকার করিতেছি।' উদাসীন তাহার বাটীতে থাকিল কারণ বাহিরের লোকের কাছ থেকে উপকার লইতে তাহার তত আপত্তি ছিল না। যে চিঠি লিখিয়াছে তাহার নাম সে জানিল না কিন্তু সেই পত্রের কারণেই সে বিদেশে প্রাণরক্ষা পাইল। যে তাহার বাস্তবিক উপকার করিল তাহাকে সে এখনও জানিতেছে না; মনে কর যখন সে জানিতে পারিবে তখন তাহার প্রতি কেমন কৃতজ্ঞ হইবে। সেই প্রকৃত বন্ধু যে উপকার করিয়া প্রত্যুপকার প্রার্থনা করে না। যে ব্যক্তি কাশীতে তাহাকে আশ্রয় দিল সেও অবশ্য কৃতজ্ঞতার পাত্র কিন্তু তাহাপেক্ষা কতদূর কৃতজ্ঞতার পাত্র তিনি যিনি সেই পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতেছি। তিনি পিতা মাতাকে স্নেহ দিয়া বলিয়া দিলেন আমার এই লোকটীকে দেখিও। শিশু মৃতপ্রায় হইয়া সংসারে আসিলে অমনি মাতা পিতা তাহাকে আদর করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। সে জানিতেছে যে পিতামাতা দ্বারাই লালিত হইতেছে কিন্তু যাঁহার আদেশে তাঁহারা লালন পালন করিতেছেন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। আমরা এখানে যাঁহার দ্বারা লালিত পালিত হই তাঁহারই ঋণ শত বৎসরে পরিশোধ করিতে পারি না তো যাঁহার আদেশে তাঁহারা লালন পালন করিতেছেন, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে উপার্জ্জন করিতেছেন, সুখে থাকিব বলিয়া সমুদয় বিষয় দিয়া যাইতেছেন তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কিরূপভাব হয়? তাঁহাকে বরাবর প্রীতি ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। ঈশ্বরের মঙ্গলভাব এ প্রকার যে তিনি দেখান না যে তিনি কিছু করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি সূর্য্য সে আমাদের কর্ম্ম করিতেছে, চন্দ্র সে আমাদের কর্ম্ম করিতেছে, অন্ন আমাদের আহার যোগাইতেছে; তিনি নিজে যে উপকার করিতেছেন তাহা আমাদের দেখাইতেছেন না; তিনি দেখাইতেছেন যেন কিছুই করিতেছেন না; অথচ তিনি আপনিই সকলের ভিতরে ভিতরে থাকিয়া কার্য্য

করিতেছেন। তিনি আপনি ধরা দিতে চাহেন না। তিনি সকলের কর্ত্তা হইয়া বন্ধু হইয়াও এমনি অসক্ত রহিয়াছেন যে কেহ দেখিতে পায় না। যে পৃথিবীতে আসিয়া পিতামাতাকে ভক্তি না করে, ভাই বন্ধুকে প্রীতি না করে, সে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না; আবার যে পৃথিবীতে আসিয়া পরম পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয় সে একেবারে যথার্থ মনুষ্যের অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয়। যেমন কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পিতামাতার প্রতি স্বাভাবিক সেইরূপ পরম পিতার প্রতি তাহা স্বাভাবিক। যে যতটুকু উপকার করে তাহার প্রতি ততদূর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

সেই যিনি আমাদিগের আরাধ্য দেবতা তিনি কেমন; তাঁহার ভাব কি প্রকার? তিনি মহান, নিরবদ্য সুন্দর পদার্থ। সংসারে যাহা কিছু গুণ আছে তাহার জন্য যদি কাহাকেও প্রীতি করি, সংসারে যাহা কিছু উপকার প্রাপ্ত হই তাহারও জন্য যদি কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞ হই; তবে যিনি অজস্ররূপে উপকার করিতেছেন, যিনি সদ্ভাবে মঙ্গল ভাবে পূর্ণ, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাকে প্রীতি করা কত উচিত। ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যে প্রীতি তাহাই আত্মার তৃপ্তি-কর, তাহা আত্মার তৃপ্তির স্থল। আত্মা আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ঈশ্বরেতেই তৃপ্ত হয়। আত্মার স্পৃহা ও প্রীতি ঈশ্বরে; ঈশ্বরের সুন্দর মঙ্গলরূপে আত্মার প্রকৃত প্রীতি। কিন্তু একেবারে সেই সুন্দর স্বরূপে আমাদের মন নিমগ্ন হইতে পারে না বলিয়া তিনি তাঁহারি সুন্দর ভাবকে সংসারে বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে আত্মা তাঁহাকে ধরিতে পারে সে ত কৃতার্থ হয়; কিন্তু তাঁহার প্রতি যে আত্মার প্রীতি উদ্দীপ্ত হয় না, যে আত্মা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপকে দেখিতে পায় না সে কি একেবারে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন থাকিবে? যাহাতে এই প্রকার না হয় এই জন্য তিনি আপনার সুন্দর ভাব সংসারে বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে সেই সকলে মনের প্রীতি যায়। তাঁহারি নির্দ্দোষ অপরিমিত সুন্দর ভাব এই দোষগুণবিশিষ্ট সংসারের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহারি সুন্দর ভাবের কণা সকল এখানে প্রস্থত রহিয়াছে। তিনি এক সুন্দর কিন্তু সংসারে কোটি কোটি-রূপ সুন্দর বস্তু করিয়া দিয়াছেন। যে সেই পরমাত্মা-তে প্রীতি দিতে না পারিবে সে বিষাদসাগরে যাহাতে নিমগ্ন না হয় তজ্জন্য সুন্দর ভাবের কণা সকল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন যাহাতে সে সকলেও প্রীতি

করিয়া থাকিতে পারে; যতক্ষণ ঈশ্বরে যাইতে না পারে ততক্ষণ সংসারে যে সকল সুন্দরের কণা চতুর্দ্দিকে কোটী মূর্ত্তিতে রহিয়াছে, তাহাতেও প্রীতি দিয়া থাকিতে পারে। যদি সে সকল সুন্দর বস্তু না থাকিত তাহা হইলে আমরা থাকিতে পারিতাম না। সেই সকল সুন্দর বস্তু যেন সোপান, যাহা দ্বারা সেই পরম সুন্দরে আরোহণ করি। আমরা পরিবর্ত্তন নহিলে থাকিতে পারি না; সেই অপরিবর্ত্ত সুন্দরে অপরিবর্ত্ত আত্মা দিলে থাকিতে পারি। কিন্তু তাঁকে যে অপরিবর্ত্ত আত্মা দিয়ে থাকিতে পারি আমাদের এরূপ ক্ষমতা নাই। যে রকম মনের ভাব, যেন নদীর স্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে; এইজন্য সুন্দর ভাবের পরিবর্ত্ত ব্যতীত একটা স্থানে অধিক কাল থাকিতে পারি না; এই জন্য সংসারে এমন সুন্দর কিছুই নাই যাহা হইতে আবার আর একটাতে না আসিতে চাই। আমরা এখানে একটা সুন্দর থেকে আর একটা সুন্দরে আসিতে পারি, একটা সুন্দর বস্তুতে বদ্ধ থাকিলে বিরক্ত হই; সে সুন্দর এমন নহে যে মন তাহাতে নিবিষ্ট থাকিতে পারে; এই জন্য ঈশ্বর দেখ কত সুন্দর বস্তু সকল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাতঃকালে মেঘের মধ্য দিয়া সূর্য্য উঠিতেছে তাহারো পূর্ব্বে যখন মেঘের উপরে কেবল দাগগুলা পড়িয়াছে, সেই সময় হইতে সুন্দরভাব কত রকমে কেমন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। উষা অবধি অস্ত পর্য্যন্ত যদি অতগুলা ছবি করা যায় তবে কতগুলা ছবি হয়। উষায় সময় এক-ভাব সূর্য্য উদয়ের সময় একভাব, এখন একভাব, দুপুর বেলা একভাব। চৈত্র বৈশাখ মাসে দুপুর বেলায় রৌদ্র যখন চক্‌মক করিতে থাকে আর চারিদিকে নিস্তব্ধ হয় তখন মাঠের মধ্যে কি উদাস ভাব হয়; আবার রাত্রের এক রকম ভাব। দেখ সৌন্দর্য্যের কি পরিবর্ত্তন, কত প্রকার ভাব হইতেছে, কোটি পরিবর্ত্তন বলিলেও তাহার অন্ত পাওয়া যায় না; একটী দিন রাত আর এক দিন রাতের মতন হয় না; পনের দিন চন্দ্রের পনর রকম ভাব। বৎসরের মধ্যে ছয় ঋতু, ঋতুর মধ্যে দুই মাস, মাসের মধ্যে দুই পক্ষ, পক্ষের মধ্যে দুই সপ্তাহ, সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন, দিনের মধ্যে অহোরাত্র, অহোরাত্র চব্বিশ ঘণ্টা, ঘণ্টার মধ্যে ষাটি মিনিট, মিনিটের মধ্যে ষাটি সেকেণ্ড। দুই সেকেণ্ড একভাব আমরা কখনই দেখিতে পাই না; যদি সৌন্দর্য্য কি দেখিতে চাই এমন একটা সময় পাই না যখন তাহার পরিবর্ত্তন না দেখিতে পাই।